স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন

অশোক গুপ্ত

125

2928 (~~6002~~)

S/F

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন

(১৯৬৮ সালের ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতির পূর্ণ বিবরণ সহ)

অশোক গুপ্ত
অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, তমলুক

S. C. E. R. T. West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

জে, এন, ঘোষ এণ্ড সনস্
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
"শিক্ষার" পক্ষে
শ্রীঅজিত কুমার ভট্টাচার্য্য
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 28.5.95
Accn. No. 9178

2928

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ
রূপরেখা প্রেস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

রাধাকৃষ্ণণ মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে তিনটি মূল্যবান দলিল। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্যকে জানতে হলে এই তিনটি কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ বাইশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও আমরা প্রধানত সেই বিদেশী-শাসক প্রবর্তিত কেরাণী-গড়ার শিক্ষার জের টেনে চলেছি। ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার জগতে কিছু কিছু কাঠামোগত সংস্কার সাধিত হলেও, শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন কিছু হয়নি বরং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার বহুমুখীকরণের নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তাকে নিছক অপব্যয় বললেও বোধহয় অতুক্তি করা হবে না। সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষার মান যেরূপ দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হচ্ছে তাতে একথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে সবকিছু এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমরা অন্তঃসারশূন্যতার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌছাব কিনা অথবা তার আগেই শিক্ষার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিছু ঘটবে? বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ'। এ কথা যেমন সত্য তেমনি এটাও মনে রাখতে হবে অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা তিল তিল করে ক্ষয়রোগের জীবাণুর মত জাতির মেরুদণ্ডকে ঝাঁজরা ক'রে ফেলে।

চন্দ্রলোকে মানুষের পদার্পন ঘটার পর আমাদের আজ স্থির মস্তিষ্কে এ কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশ-গুলি আজ কি মারাত্মক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম শিল্প-বিপ্লবের পর বিগত দুশো বছর ধরে পশ্চিমে অব্যাহত গতিতে যে শিল্পোন্নতি ঘটে চলেছে আজও আমরা তার অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি। আমাদের দেশে কি কৃষি, কি শিল্প কোনক্ষেত্রেই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আজও শুরু হয়নি। অথচ ইতিমধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি দ্বিতীয় একটি শিল্প-বিপ্লবের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। এই দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃতি পূর্বেকার শিল্প-বিপ্লবের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ শিল্প-বিপ্লব হল স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতা (automation) এবং যন্ত্রগননবিদ্যার (cybernetics)। পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে আজ যে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে তার পিছনে কি গুটিকতক বৈজ্ঞানিকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই কেবল কাজ করছে? আমরা লক্ষ্য করেছি চন্দ্র অভিযানের পিছনে রয়েছে হিউস্টনের কয়েক সহস্র বৈজ্ঞানিক ছাড়াও লক্ষ লক্ষ সুদক্ষ কারিগরের অক্লান্ত ও ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টা। এই সব লক্ষ লক্ষ সুদক্ষ কারিগর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সেখানকার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায়—যে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষা পাশ করানো নয়। অপরপক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের বিপুল জনসংখ্যার সামান্য অংশ যে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে সে শিক্ষা প্রধাণত গ্রন্থকেন্দ্রিক, বহির্জগতের কর্মপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উন্মেষসাধনে অক্ষম। অথচ আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে একদিকে যেমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে শিশু তার ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-কর্মসূচীতে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর জন্যই আজ আমাদের দেশে একটি বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোঠারি কমিশন যে বক্তব্য রেখেছেন তার উপযোগিতা কতখানি তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

বর্তমানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সমাজ-দেহে যখন নানাবিধ মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ সুস্পষ্ট তখন অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক একটি ব্যাধির উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে তা দূর করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে বিশেষ লাভ নেই। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি আজ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে, তার স্থান পূরণের জন্য নতুন সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলবার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না, সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি, অরাজকতা, শ্রেণীবৈষম্য, বেকারী ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা—ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতাকে এই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। কেবল শিক্ষার আধুনিকীকরণের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান ঘটবে না। শিক্ষার আধুনিকীকরণের ফলে যে দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে, যে দেশের মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে, সেই দেশের যুব-সম্প্রদায়ের

একটি বিরাট অংশ জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের অভাবে আজ দিশাহারা! কাজেই শিক্ষার আধুনিকরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হলে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ করলে চলবে না। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূল পরিচালক শক্তি এবং ক্রমবর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে যেমন সঞ্জীবিত করতে হবে, তেমনি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার এইসব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন, মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশনের সুচিন্তিত অভিমতগুলি আমাদের বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আলোচ্য কমিশন তিনটির সুপারিশগুলি সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় নয়। কমিশনগুলি সে দাবীও অবশ্য করেন নি। কাজেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশগুলির কার্যকারিতা আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনবোধে সেগুলির পরিবর্ত্তনও সাধন করতে হবে। পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মত নমনীয়তা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণন, মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশনের সুবৃহৎ রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষত বি. টি. পরীক্ষার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নে এই গ্রন্থটি উপরোক্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে এ আশা রাখি। এ কথা বলা বাহুল্য আলোচ্য কমিশনগুলির মূল রিপোর্টের আকর্ষণ এ জাতীয় গ্রন্থের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবার নয় এবং মূল রিপোর্টের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যারা আরও বিশদভাবে জানতে চান তাঁদের অবশ্যই সেগুলি পাঠ করতে হবে।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন পরিভাষা চয়ন করার ব্যাপারে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের বি. টি. বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর সন্তোষ কুমার ঘোষ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া সহকর্মী অধ্যাপক গৌরদাস হালদার,

অধ্যাপক সুখেন্দু রায় এবং আমার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। 'শিক্ষা'-প্রকাশনীর শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইতি—২রা অক্টোবর, ১৯৬৯।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়
বি. টি. বিভাগ

শ্রীঅশোক গুপ্ত

সূচীপত্র

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন

বা

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট

(ডিসেম্বর ১৯৪৮ আগষ্ট ১৯৪৯)

[সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

ভূমিকা

ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান এবং তার উন্নতিবিধানের জন্য বিশ্বরিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উপায় সম্পর্কে পথনির্দেশ করতে বলা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নামেও সুপরিচিত। ভারতবর্ষ ও বিদেশের ১০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়।

কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুলি সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয় :—

১। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্য।

২। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংবিধান, পরিচালনা, কার্যাবলী ও এখ্তিয়ার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত সম্পর্ক।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থ-সংস্থান (finance)।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনস্থ কলেজগুলির শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা।

৫। মানবতামূলক বিষয় (Humanities) ও বিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং তার স্থিতিকাল নির্দ্ধারণ।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ভর্তির মান নির্দ্ধারণ এবং এ সম্পর্কে একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঞ্ছনীয়তা।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম।

৮। ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ললিতকলা (fine arts) সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ।

৯। আঞ্চলিক ও অন্যান্য ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা।

১০। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত শাখায় উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা এবং পরিশ্রম ও সঙ্গতির অপচয় দূর করার জন্য সুসংগঠিতভাবে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদান।

১২। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুশলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ বিশেষ সমস্যা।

১৩। শিক্ষকদের যোগ্যতা, চাকুরীর সর্ত, বেতন, সুযোগ সুবিধা ও কার্যাবলী ; শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণায় উৎসাহদান।

১৪। ছাত্রশৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা ও শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়।

কমিশন ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শন করে সর্বত্রই জাতীয় মঙ্গলের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করেন। কমিশন আরও লক্ষ্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করলেও সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও পরীক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল ভবিষ্যতের স্রষ্টা, কাজেই তারা পুরানো আদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি জাতীয় জীবনে তার সার্থক ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে সমাজের জটিলতাবৃদ্ধি ও তার কাঠামোগত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য

(The Aims of University Education)

স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও সেই পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে। রাজনীতি. শাসনকার্য পরিচালনা, বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর। সাহিত্যধর্মী, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয়কেই মেটাতে হবে। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী এবং এখানকার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও কর্মশক্তি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুষ্যশক্তির প্রকৃত সদ্ব্যবহার হতে পারে।

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল সভ্যতার প্রকৃত মাধ্যম। বর্ত্তমান যুগের সংশয়কে কাটিয়ে উঠতে হলে ভারতবর্ষকে তার বিদ্বান ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, কবি, শিল্পী, ও আবিষ্কর্তাদের উপর নির্ভর করতে হবে। সভ্যতার আলোকবাহী এইসব বুদ্ধিজীবীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতার মধ্যে কোন প্রকার সংস্কার করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন প্রখর চিন্তাশক্তি ও পরিকল্পনা। আমাদের নেতৃবৃন্দকে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সুদূর প্রসারী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে।

সভ্যতার মাধ্যম

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখতে হলে কেবল অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না, নতুন নতুন সম্ভাবনার কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের সামনে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ; সেই ভবিষ্যতের দিকে দুঃসাহসিক অভিযানের মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই আমাদের জ্ঞানরাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হবে।

জ্ঞানরাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান

বর্ত্তমান যুগ হল অবিশ্বাস ও উদ্দেশ্যহীনতার যুগ। এই অবিশ্বাস ও উদ্দেশ্যহীনতার জন্যই আমাদের জীবনযাত্রার মানের অধঃপতন ঘটেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রের সম্মুখে সমগ্র জগতের একটি সুসঙ্গত চিত্র এবং

মানবজীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপ উপস্থিত করা। মানুষ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগবিহীন তথ্যসম্ভার নিয়ে বাঁচতে পারে না—সে সমস্ত বস্তুকে মিলিয়ে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম রচনার সময় আমাদের এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন

আমরা যে সমাজের উপযোগী করে ছাত্রদের গড়ে তুলছি সেই সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। আমাদের সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যের মধ্য থেকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল নীতিগুলি খুজে পেতে পারি। আমাদের পবিত্র সংবিধানে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রের মূল কথা হল—সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তির দেহ, মন ও ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে না। সেইজন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে হবে। এছাড়া মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এবং বিভেদকারী শক্তিকে পরাস্ত করে একত্রে বসবাস ও কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে বিভিন্নধরনের কারিগর, সমাজনেতা ও সুদক্ষ পরিচালকদের গড়ে তুলছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসন, এবং শিক্ষকদের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর। শিক্ষার জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তা নির্ভর করবে সকলকে সমান সুযোগপ্রদান, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূরীকরণ, এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির চাহিদা পুরনের উপর। শিক্ষার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দিক থেকে প্রশ্নটি বিচার করতে হবে। জাতীয় ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, যৌথ জীবন-যাপনের অভ্যাস, ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানঅর্জন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; আর আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অখণ্ডতা সম্পর্কে

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা

ধারণাপ্রদান এবং বিভিন্নদেশের অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে পরিচিতি দান করার চেষ্টা করতে হবে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি হল প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রতি আস্থা; আর শিক্ষার লক্ষ্য তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশসাধন। শিশু তার আপন স্বভাব অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিশুর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শারীরশিক্ষার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। সুস্থ ও সবল শরীর ছাড়া বৌদ্ধিক সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। কাজেই ব্যায়াম ও খেলাধূলার চর্চ্চার দ্বারা ছেলেমেয়েরা যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানসিক প্রবণতার দিক দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ, কর্মপ্রিয় প্রভৃতি নানাধরণের লোক দেখা যায়। সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি ছাত্র যাতে নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশলাভ করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রদের বিভিন্ন মানসিক প্রবণতাগুলি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় ঘটবে না।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন

মানুষের অস্তিত্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আত্মিক। এই তিন প্রকার অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার বিষয়বস্তুকেও আমাদের সেই অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে,—বস্তুজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, মানবসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং আত্মিকজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। অর্থাৎ যে জাগতিক পরিবেশে ছাত্র বাস করছে তার সম্পর্কে ছাত্রের কিছুটা সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যে সমাজে সে বাস করছে তার সম্পর্কেও ছাত্রকে জানতে হবে। এর জন্য ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রয়োজন। মানবতামূলক বিষয়ের (humanities) উদ্দেশ্য হল মানুষকে তার অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্খা ও আদর্শ সম্পর্কে সজাগ ক'রে তোলা। সাহিত্যও মানুষের আত্মাকে উদ্দীপিত ও প্রসারিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষাদান করার

প্রাকৃতিক সামাজিক ও আত্মিক শিক্ষা

সময় সেগুলিকে এক অখণ্ড জ্ঞানের অংশীভূত বিষয় হিসাবে উপস্থিত করতে হবে।

সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সকলে দারিদ্র্য, ভীতি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যখন দারিদ্র্য, ব্যাধি, অনাহার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন আমরা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে এবং জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি এবং আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের অবস্থা শোচনীয়। আমরা যদি কৃষি উৎপাদন বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের চাষীদের সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং কৃষি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তিমূলক, কৃষি-বিষয়ক, মেডিক্যাল ও ইনজিনীয়ারিং কলেজ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরী, চিকিৎসা ও কৃষি বিদ্যার প্রসার

বিভিন্নপ্রকার বৃত্তি ও জনজীবনের জন্য যোগ্য অধিনায়ক গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বসাহিত্যে লিপিবদ্ধ মানব-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায়, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত সামাজিক শক্তি কাজ করছে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং বস্তুগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত রকম জটিলতা উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যে সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি তা কেবল যান্ত্রিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল নয়, সে সভ্যতা গড়ে উঠবে প্রধানত মানবচরিত্রের ভিত্তির উপর। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল মানব চরিত্রের উন্নতিসাধন করা।

সুযোগ্য অধিনায়ক সৃষ্টি

ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশলাভের সুযোগ প্রদান হল গণতন্ত্রের অন্যতম মূলভিত্তি। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী শিক্ষার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করে থাকে এবং ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সেখানে বিঘ্নিত হয়। তাই

গণতন্ত্রের স্বার্থে শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তার করার প্রবণতা আমাদের রোধ করতে হবে। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে সরকারী সাহায্য ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এ দুটি এক জিনিস নয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বাধাহীন স্বচ্ছন্দ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা এবং অপর কোন শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাজে বাধাদান করতে পারবে না।

সরকারী কর্তৃত্বের বিলোপসাধন

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি যেমন আপন অধিকার সম্পর্কে সজাগ হবে তেমনি অপরের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তাকে যত্নবান হতে হবে। গণতন্ত্র জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমানাধিকার দান করে। শিক্ষার মাধ্যমেই গণতন্ত্র সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সমানাধিকার ও সাম্যের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি ব্যক্তি যাতে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষালাভের সমান সুযোগপ্রদান

ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ও ছাত্র সংসদে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কলেজের পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী (extra curricular activities) যৌথভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ছাত্রদের শিক্ষিত ক'রে তোলে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা, সদ্ব্যবহার, ধৈর্য্য, নিঃস্বার্থ মনোভাব, অপরের প্রতি বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করা যায়। সেইজন্য ছাত্রদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তারা উন্নত সমাজজীবন যাপন করতে শিখবে।

উন্নত সমাজজীবন যাপনের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বজায় রাখার শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সুদূর সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য চলে আসছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বক্তব্য হল আত্মানুসন্ধান। কেবল পার্থিব সুখের মধ্যে

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা

ভারতবাসী কোনদিন পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। সে আত্মার সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়েই ভারতবাসীর মনে বিশ্বপ্রেমিকতার উন্মেষ ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিতে হবে। বিভিন্নপ্রকার সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে অনেক উন্নত সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে।

আন্তর্জাতীয়তাবাদের শিক্ষা

যানবাহনের অগ্রগতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর এই অখণ্ডতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল সত্য এক ও অভিন্ন, একথা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধার্মিক প্রভৃতি সমস্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অপরের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা যদি গণতন্ত্রের মূল কথা হয় তাহলে কেবল নিজ নিজ জাতীয় ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে বাধ্য। অন্ধভাবে কোন একটি জীবনদর্শনকে আঁকড়ে থাকা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়। যদি আমরা সকল মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা স্বীকার করে নিই তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষের আশা-নিরাশা, প্রয়োজনীয়তা ও ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে।

বিশ্বনাগরিকতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানকার্যসূচী প্রত্যেকের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়

বিশ্বনাগরিকতা অর্জনের শিক্ষা

যথা অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকাশ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্বসংস্থার কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংক্ষিপ্তসার :—সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উচ্চ মানের উপর গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। শিক্ষার বিস্তার, নতুন জ্ঞানের অবিরাম অনুসন্ধান, জীবনের অর্থানুসন্ধানের অবিরত প্রচেষ্টা, সমাজের পেশাগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি হল উচ্চ-শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একই প্রকার মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে তোলা দরকার। আমাদের নীতি ও কর্মসূচী এমন হওয়া দরকার যাতে তার দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমরা শিক্ষাদানের জন্য যে-কোন মাধ্যমই গ্রহণ করি না কেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল নাগরিকের বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনত', মানুষের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আমাদের আনুগত্য রক্ষা করে চলতে হবে।

কোন দেশের বিশালতা তার রাজ্যের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারতা, সম্পদের পরিমাণ, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না, যদিও এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমর কেবল বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজে একটা পরিবর্তন আনতে পারি ঠিকই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের অন্তরাত্মা যাবে শুকিয়ে। তখন সমাজ লাভ করবে বিবেকহীন বিজ্ঞানী, এবং রুচিহীন ও শূন্যগর্ভ কারিগর। সেক্ষেত্রে তাদের উদ্যমের অভাব ও উদ্দেশ্যহীনতা দূর করার মারাত্মক প্রয়োজন দেখা দেবে এবং সর্বত্র একটি নৈতিক শূন্যতাবোধ বিরাজ করবে। আমরা যদি সভ্য হতে চাই তাহলে দরিদ্র ও নির্যাতিতদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে; নারীজাতির প্রতি বীরোচিত শ্রদ্ধাবোধ, জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি আস্থা, শান্তি ও স্বাধীনতা প্রীতি, নিষ্ঠুরতা পরিহার এবং ন্যায়ের প্রতি দুর্নিবার শ্রদ্ধা জাগাতে হবে।

আমরা যদি গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ বজায় রাখতে না পারি তাহলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতাও রক্ষা করতে পারব না। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করে যেতে হবে যাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং

মানুষ যতদিন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং ধার্মিকতার অনুসরণ করবে ততদিন এই আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া চলবে না।

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যদি আমাদের সংবিধান রচয়িতা দূরদর্শী ও অনুভূতিপ্রবণ নেতাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সঠিক পথে শিক্ষাদান করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষা লাভের প্রকৃত সুযোগ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যাদি—

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান বহুলাংশে সুযোগ্য শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করতে হলে বহুমুখী দায়িত্ব পালনে সক্ষম পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। বর্ত্তমানে শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছে। আজকাল শিক্ষকেরা ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারছেন না। অনেক শিক্ষক গতানুগতিক-ভাবে একই তথ্যাদির চর্বিতচর্বন করে থাকেন, তাতে শিক্ষাদান নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে এবং ছাত্রদের ঔৎসুক্য নষ্ট হয়। শিক্ষকদের মধ্যে তাঁদের ন্যায্য দায়িত্ব পালন অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে শিক্ষক-রাজনীতিবিদেরা অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানপিপাসু-শিক্ষকদের চেয়ে অধিক লাভবান হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকদের মনোবল কমে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে না। তাদের পাঠাগার এবং বীক্ষণাগারগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক ও সরঞ্জামের অভাবে অনুন্নত এবং জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণার সুযোগ সেখানে খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষকদের ধরে রাখতে পারছে না। শিল্পসংস্থা ও সরকার অধিক অর্থের বিনিময়ে মেধাবী ছাত্রদের মেধা ক্রয় করছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার মান ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ছাত্রেরাও ক্রমশঃ শিক্ষকদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং শিক্ষকেরাও নিজেদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় জীবনে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে

হলে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করতে হবে। কমিশন এ ব্যাপারে যে সব সুপারিশ করেছেন সেগুলি হল :—

১। শিক্ষকের গুরুত্ব এবং তার দায়িত্বকে স্বীকার করতে হবে।

২। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবগ্রস্ত তাদের অর্থাভাব দূর করতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, অধ্যাপক, রিডার, লেকচারার ও ইন্সট্রাকটার —এই চার শ্রেণীর শিক্ষক থাকবেন।

৪। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন রিসার্চ ফেলো (Research Fellow) থাকবেন।

৫। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি করতে হবে।

৬। শিক্ষকদের বেতনহার নিম্নরূপ হবে :—

প্রফেসর	৯০০৲—৫০৲—১৩৫০৲
রিডার	৬০০৲—৩০৲—৯০০৲
লেকচারার	৩০০৲—২৫৲—৬০০৲
ইন্সট্রাকটার অথবা ফেলো ...	২৫০৲
রিসার্চ ফেলো ...	২৫০৲—২৫৲—৫০০৲

৭। যে সব অনুমোদিত কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী নেই তাদের বেতন হার :

লেকচারার ...	২০০৲—১৫৲—৩২০৲—২০৲—৪০০৲
সিনিয়র ...	৪০০৲—২৫৲—৬০০৲ (প্রত্যেক কলেজে দুজন)
প্রিন্সিপ্যাল ...	৬০০৲—৪০৲—৮০০৲

যে সব কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী আছে :

লেকচারার ...	২০০৲—১৫৲—৩১০৲—২০৲—৪০০৲ —২৫৲—৫০০৲
সিনিয়র ...	৫০০৲—২৫৲—৮০০৲ (দুজন)
প্রিন্সিপ্যাল ...	৮০০৲—৪০৲—১০০০৲

৮। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯। জুনিয়র ও সিনিয়র পদের অনুপাত হবে ২ : ১।

১০। অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৬০ বছর ; কিন্তু প্রফেসরদের ক্ষেত্রে তা ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।

১১। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুটি ও কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে সর্তাদি সুনির্দিষ্টভাবে রচনা করতে হবে।

শিক্ষাদানের মান

(Standards of Teaching)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হল শিক্ষাদান ও পরীক্ষণের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা। বিশ্ববিদ্যালয় হল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এখানে শিক্ষকদের প্রচেষ্টাদ্বারা ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করে সেখানে কি ধরণের স্নাতক সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষক ও গবেষক ছাত্রদের দ্বারা কিরূপ গবেষণাকার্য চলছে তার উপর। এই দুটি কাজ পরস্পরের পরিপূরক—উন্নতমানের স্নাতক সৃষ্টি না হলে গবেষণার উন্নতি ঘটবে না, আবার গবেষণার উন্নতি না হলে শিক্ষকেরা উন্নতধরণের শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষণের মান খুবই অনুন্নত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান উন্নত না হলে দেশে বা বিদেশে কোনখানেই আমাদের ডিগ্রীর মর্যাদা থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করতে হলে আমাদের ডিগ্রী যাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই নিম্নমানের। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা তারা লাভবান হতে পারে না। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষারও উন্নতি করা প্রয়োজন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে ছাত্রকে ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন:

১। বিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে মোট ১২ বছর শিক্ষাগ্রহণের পর ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে।

২। প্রত্যেক প্রদেশে অধিক সংখ্যক উন্নত ধরণের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে।

৩। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের শেষে কিছু সংখ্যক ছাত্র যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে।

৪। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে রিফ্রেশার কোর্সের (refresher course) ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ভীড় কমানোর জন্য কলা ও বিজ্ঞান শাখায় সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০ এবং অনুমোদিত কলেজে ১৫০০ নির্দ্দিষ্ট করে দিতে হবে।

৬। কাজের দিনের সংখ্যা বছরে ১৮০ করতে হবে ; এর মধ্যে পরীক্ষার দিনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না ; শিক্ষাবর্ষকে ৩টি পর্যায়ে (term) ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের স্থিতিকাল হবে ১১ সপ্তাহ।

৭। সুপরিকল্পিতভাবে পাঠদান করতে হবে এবং টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরীর কাজ ও লেখাজোখার কাজের (written exercise) সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

৮। অধ্যয়নের কোন শাখার জন্যই নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক থাকবে না।

৯। অবস্নাতক ছাত্রদের ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশেষ কয়েকপ্রকার ছাত্রদেরই কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষা (Public examination) দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। চাকুরীজীবীদের জন্য সান্ধ্য কলেজ খোলা যেতে পারে।

১০। নিম্নলিখিতভাবে সকল প্রতিষ্ঠানে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে—

(ক) প্রত্যেক গ্রুপে ৬ জন করে ছাত্র থাকবে।

(খ) পাশকোর্স ও অনার্সের সকল অবস্নাতকদের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) টিউটোরিয়াল ক্লাসে কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, ছাত্রদের মানসিক বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) টিউটোরিয়াল ক্লাস যথাযথভাবে করতে হলে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) অধিক অর্থ বরাদ্দ,

(খ) অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান,

(গ) কার্যকাল বৃদ্ধি,

(ঘ) উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা,

(ঙ) শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ।

১২। সর্বপ্রকারে বীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন করতে হবে।

পাঠ্যক্রম—কলা ও বিজ্ঞান

(Courses of Study—Arts and Science)

কলা ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি হল নিম্নরূপ :

১। ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর ছাত্রেরা কলা ও বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কিংবা তদনুরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

২। অনার্স ছাত্রেরা এক বছর ও পাশকোর্সের ছাত্রেরা দু বছর পর মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকবে, এবং সেইমত পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্রেরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪। সাধারণ শিক্ষার মূলনীতি যথাশীঘ্র প্রণয়ণ করতে হবে এবং তা কার্যে পরিণত করতে হবে।

৫। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষধর্মী শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে, এবং তা করার সময় ছাত্রদের সাধারণ আগ্রহ এবং বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা : কলা ও বিজ্ঞান

(Post-Graduate Training and Research : Arts and Science)

কলা ও বিজ্ঞান শাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কে কমিশন যেসব সুপারিশ করেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১। কলা ও বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রীর নিয়মকানুনের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে। পাসকোর্সের গ্র্যাজুয়েটকে দু' বছর এবং অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে এক বছর পড়াশুনা করতে হবে। নিয়মিত পাঠদান, সেমিনার ও ল্যাবরে-

টারীর কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক থকেবে।

২। পি. এইচ. ডি ডিগ্রীর শিক্ষণকাল হবে দু বছর। এই ডিগ্রীর জন্য থিসিস ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্ভবমত প্রতিটি শাখায় গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য কতকগুলি রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। উচ্চমান বিশিষ্ট ও মৌলিকতা সম্পন্ন কাজের জন্য ডি. লিট এবং ডি. এস. সি ডিগ্রী দেওয়া হবে।

৬। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য আমাদের দেশে যেসব উপাদান (resource) আছে গবেষকদের তা সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৭। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করার মত লোকের যথেষ্ট অভাব থাকায় অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

৮। এম্. এস্. সি ও পি. এইচ্. ডি. স্তরে মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষা-মন্ত্রককে অধিক সংখ্যক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মৌলিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে গবেষণাকার্যে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিকল্পে ৫টি সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান কেন্দ্র থাকা উচিত এবং সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১২। বায়োকেমিষ্ট্রি, বায়োফিজিক্স, জিওকেমিষ্ট্রি, জিওফিজিক্স প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার অধিক সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

পেশাগত শিক্ষা
(Professional Education)

পেশাগত শিক্ষা (Professional education) বলতে কমিশন পেশাগত উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ও যথাযোগ্য কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকে

বুঝিয়েছেন। যে সব কাজের জন্য উন্নত ধরণের দক্ষতা এবং জ্ঞান ও শৃঙ্খলা-যুক্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় সেই সব কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকে পেশাগত শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তুতির প্রয়োজন তাকে আমরা **বৃত্তিমূলক (vocational)** কিংবা **কারিগরী (technical)** শিক্ষা বলতে পারি।

কমিশন তাঁদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত পেশাগুলির পাঠ্যসূচী ও স্থিতিকাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—

১। কৃষি; ২। বাণিজ্য, ৩। শিক্ষাতত্ত্ব; ৪। ইনজিনীয়ারিং ও টেকনোলজি; ৫। আইন এবং ৬। চিকিৎসাবিদ্যা (medicine)।

১। কৃষি-সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) কৃষিশিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিচার্য-বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) যথাসম্ভব বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিশিক্ষা দিতে হবে।

(ঘ) কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করতে হবে। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলিকে যুক্ত করতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে অধিক সংখ্যক পরীক্ষামূলক খামার স্থাপন করতে হবে।

(চ) কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে উন্নত করতে হবে।

২। রাজ্য সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ :

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় বাণিজ্যের ছাত্রকে তিন চার প্রকার বিভিন্ন ফার্মে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

(খ) স্নাতক হবার পর কিছু সংখ্যক ছাত্রকে কোন একটি বিশেষ পেশায় (যেমন এ্যাকাউনটেন্সি) পারদর্শিতা লাভ করার সুযোগ দিতে হবে।

(গ) বাণিজ্য বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রীর শিক্ষা যাতে কম পুঁথিঘেঁসা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ছাত্র যাতে এই শিক্ষা লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩। শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ :

(ক) শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রমকে নতুনভাবে রচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ে

হাতে কলমে কাজ করার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করতে হবে এবং ছাত্রদের কাজের মূল্যায়ন করার সময় তার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(খ) ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical training) নেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে।

(গ) বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষাদান চলছে তাকেই কিভাবে অধিকতর উন্নত করে তোলা যায় সে ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিকে ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

(ঙ) শিক্ষার তত্বগত বিষয়কে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করার পূর্বে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাদানকার্যে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ছ) অধ্যাপকদের মৌলিক কাজগুলি যাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪। ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ঃ

(ক) বর্ত্তমান ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন স্তরের ইনজিনিয়ারিং স্কুলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) ইনজিনিয়ারিং-এর সমস্ত শাখার প্রথম বছরের পাঠক্রম একরূপ হবে।

(ঘ) কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে কর্ম-অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে।

(ঙ) সম্ভবমত বর্ত্তমান টেকনোলজিক্যাল কলেজগুলিকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে।

(চ) উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলি কোন মন্ত্রক অথবা সরকারী বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে।

(জ) প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশন আলোচ্য শিক্ষার

উন্নতিকল্পে যাতে অধিক অর্থ সাহায্য পায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। আইন (Law) সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ঃ

(ক) আইন শিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুর্নগঠন করতে হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় আইন শাখার কর্মীনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের ভার গ্রহণ করবে।

(গ) আইন বিভাগে ভর্ত্তির জন্য তিন বছর ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) আংশিক ও পুরা-সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আংশিক সময়ের শিক্ষকেরা ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন।

(ঙ) আইনের ডিগ্রী কোর্সের ছাত্র বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া একই সঙ্গে অন্য ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না।

(চ) আইনের প্রত্যেকটি শাখায় গবেষণার সুযোগ দিতে হবে।

(ছ) মাঝে মাঝে ছাত্রদের অগ্রগতির পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৬। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ঃ

(ক) প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১০০ জন।

(খ) যে বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য হাসপাতালের সাহচর্য প্রয়োজন সেই বিভাগগুলিকে হাসপাতালের সংলগ্ন হতে হবে।

(গ) প্রত্যেক ছাত্র পিছু ১০টি করে শয্যা থাকবে।

(ঘ) অব-স্নাতক ও স্নাতক স্তরে কোন গ্রামীন কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে।

(ঙ) পাবলিক হেল্থ ইন্জিনিয়ারিং ও নার্সিংকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(চ) উন্নততর কলেজগুলিতেই কেবল স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(ছ) দেশীয় প্রথায় গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভারতীয় প্রণালীসহ ভেষজ শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত পেশাগুলি ছাড়াও কমিশন ব্যবসা পরিচালনা (Business Administration), পাবলিক এ্যাডমিনিসট্রেশন (Public Administration), শিল্প-সম্পর্ক (Industrial Relations) প্রভৃতি কতকগুলি নতুন পেশার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

ধর্মীয় শিক্ষা

(Religious Education)

ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ কয়েক মিনিটের নীরব প্রার্থনা দিয়ে শুরু করতে হবে।

(খ) ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বছরে গৌতম বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কবীর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) দ্বিতীয় বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশ্বজনীন আবেদন যুক্ত কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) তৃতীয় বছরে ধর্মীয় দর্শনের মূল সমস্যাগুলি আলোচনা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যম

(Medium of Instructions)

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়টি কমিশন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। কমিশন এ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রশ্নটির সঙ্গে ভাবপ্রবণতা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিবেচনা করা কষ্টকর।

দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারতীয় ভাষার সাহায্যে ইংরাজীকে অপসারিত করা সম্পর্কে জাতীয় দাবী ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিদেশী ভাষার আধিপত্য জাতির আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী ব্যক্তিরা আশা করেছিলেন যে আশু-

প্রাদেশিক যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তাদের যখন বলা হল প্রশ্নটি বেশ জটিল এবং এর আশু সমাধান সম্ভব নয়, তাঁরা কিছুটা বিস্মিত ও আহত হলেন।

এই সমস্যার জটিলতা নিহিত আছে ভারতের আয়তন ও জনসমষ্টির চরিত্রের মধ্যে। পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাষার বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই ঐক্য-স্থাপনের ব্যাপারটি বেশ জটিল।

ভারতে উপভাষার সংখ্যা অজস্র হলেও সাহিত্যসম্পদ বিশিষ্ট প্রধান ভাষাসমূহ যেগুলি শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার দাবী রাখে, তাদের সংখ্যা বারটির বেশী নয়। হিন্দী ভাষার পিছনে অধিক জনসমর্থন থাকায় ঐ ভাষার স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে ঐ ভাষা যাতে উন্নত ধরণের চিন্তাধারা প্রকাশের বাহন হতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। বর্ত্তমানে হিন্দী ভাষা আইন, বিচার বিভাগ কিংবা শাসনকার্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতালাভ করে নি। এই সব কাজের জন্য হিন্দী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে। অপরপক্ষে আমাদের দেশের ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে অনেকাংশে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে। ইংরাজী ভাষার অবর্ত্তমানে আবার পূর্বেকার বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। উপরন্ত, আধুনিক সভ্যতার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে পরিচিতি, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষা আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে। তাছাড়া ইংরাজী হল আন্তর্জাতিক ভাষা এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী বিশ্বজনীন ভাষায় (world language) পরিণত হবে। এই সব কারণে ইংরাজী ভাষার চর্চা আমাদের বন্ধ করলে চলবে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার পর কমিশন শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে যে সুপারিশগুলি করেন তা হল ঃ

(ক) রাষ্ট্রভাষাকে বিভিন্নভাবে তার শব্দভাণ্ডারের উন্নতি ঘটাতে হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক কারিগরী ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিভাষা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে।

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রকে তিনটি ভাষা জানতে হবে—(১) আঞ্চলিক ভাষা, (২) রাষ্ট্রভাষা এবং (৩) ইংরাজী।

(ঙ) রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে কেবল দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে হবে এবং এই লিপির কিছু কিছু অসুবিধা দূর করতে হবে।

(চ) রাষ্ট্রভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে, ডিগ্রী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যাতে ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারি।

পরীক্ষা ব্যবস্থা
(Examinations)

অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলছে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বর্তমান। এ ব্যাপারে সমস্যার জটিলতা আশঙ্কাজনক ভাবে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, কিন্তু পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের কোন গঠনমুলক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত করা হয়নি। আমাদের যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কোন একটি বিষয়ের সংস্কার করার কথা বলা হত তাহলে আমরা পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কথাই বলতাম। পরীক্ষাব্যবস্থা উপযুক্তভাবে পরিকল্পিত হলে তা শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়তা করে। **পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ**

১। সরকারী শাসন বিভাগে চাকরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন হবে না। এর জন্য বিশেষ সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সেই পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকবে। এর দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার অনেক গলদ দূর হবে।

২। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের কাজের জন্য ছাত্রের কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া হয় না। এই কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। এর দ্বারা সমগ্র শিক্ষাবর্ষ

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 28.8.95
Accn. No. 9178

ধরে ছাত্রের কাজের মূল্যায়ন করা যাবে। তাছাড়া বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষার আগে কয়েকমাস ধরে ছাত্রের মস্তিষ্কের উপর যে গুরুতর চাপ পড়ে এবং তার ফলে ছাত্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাও দূর করা সম্ভব হবে।

বি. এ. ও বি. এস. সি এবং এম. এ. ও এম. এস. সি. পরীক্ষাতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দ্ধারিত নম্বরের ⅓ অংশ সমগ্র শিক্ষাবর্ষের কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকবে। অনুমোদিত কলেজগুলিতে যাতে এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের একটি সুষম পদ্ধতি অনুসৃত হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের সমতা যাতে রক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কার্যকরী সংগঠন গ'ড়ে তুলতে হবে যার কাজ হবে উক্ত কলেজগুলির কাজ পরিদর্শন ও তদারক করা।

৩। প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তিন বছর সময় লাগবে। তিন বছরের শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তিন বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েকটি পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিগ্রী লাভ করার আগে ছাত্রদের এইসব পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

৪। পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন বিষয় অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে না পড়ালে কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন না। প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষায় বহিঃস্থ পরীক্ষক (external examiner) একাদিক্রমে তিন বছরের বেশী পরীক্ষক থাকতে পারবেন না।

৫। পরীক্ষাগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে রচনাধর্মী পরীক্ষা ও নম্বর দেওয়ার সময় ব্যক্তিগত অভিরুচির (subjectivity) প্রয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি দূর করার ব্যাপারে অন্যান্য দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সে সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবে।

৬। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সাফল্যের মান যাতে একরূপ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তা উন্নত করতে হবে। ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীর জন্য শতকরা ৭০ নম্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য শতকরা ৫৫ থেকে ৬৯ নম্বর এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কমপক্ষে শতকরা ৪০ নম্বর পেতে হবে।

৭। সমস্ত উচ্চতর পরীক্ষায় অনুগ্রহ-নম্বর (grace-mark) প্রদানের রীতি তুলে দিতে হবে।

৮। কেবল স্নাতকোত্তর ও পেশাগত ডিগ্রীর ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা (viva-voce examination) গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে।

ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ ও ছাত্রকল্যাণ

(Students, Their Activities and Welfare)

ছাত্রদের কল্যানের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :—

১। ছাত্র নির্বাচন :

(ক) মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্রভর্ত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) প্রথম ডিগ্রী স্তরে ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী যাতে তারা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) স্নাতকোত্তর, বৃত্তিমূলক ও উন্নততর গবেষণার স্তরের কাজ-কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রতে হবে।

২। পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্য :

(ক) ভর্ত্তির সময় এবং বছরে অন্ততঃ একবার ছাত্রদের বিনাখরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব হাসপাতাল ও ঔষধালয় থাকবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকলে সংক্রামক, দীর্ঘস্থায়ী (chronic) ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি-গ্রস্ত ছাত্রদের ভর্তি করা চলবে না।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন, ঘরবাড়ী, ছাত্রাবাস, খাবার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি পরিদর্শন করা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) ছাত্রদের বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা ও ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খেলার মাঠ ও বিভিন্ন শরীর চর্চার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) ছাত্রছাত্রীদের দু বছর শারীর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) আবশ্যিক শারীর শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ট) শারীর শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম শারীর শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার (Director of Physical Education) অধীনে পরিচালিত হবে।

৪। **ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ঃ**

(ক) যে সব প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় ক্যাডেট কোর নাই তাদের এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

(খ) এই কোর পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অর্থ সরবরাহ করতে হবে।

(ঘ) বছরে একবার প্রত্যেক ইউনিটের কাজ পরিদর্শন করতে হবে।

৫। **ত্রদের সমাজসেবার কাজে উৎসাহিত করতে হবে।**

৬। **ছাত্রাবাস ঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিকে উন্নত করতে হবে। ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য আমিষ ও নিরামিষ উভয়প্রকার আহারের ব্যবস্থা থাকবে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। কোন না কোন শিক্ষককে ছাত্রাবাসে থাকতে হবে এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। ছাত্রাবাসে খেলাধূলা ও অন্যান্য যৌথ কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকবে।

৭। **বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ঃ**

(ক) ছাত্র সংসদকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে হবে।

(খ) ছাত্র সংসদ ছাত্রদের যৌথ কাজ কর্মের কেন্দ্র হবে।

(গ) ছাত্র সংসদের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না।

৮। **ছাত্রশৃঙ্খলা ঃ**

(ক) ছাত্রদের স্বশাসনের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে কিন্তু দলগত রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহিত করা চলবে না।

(খ) ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ জীবনযাত্রা প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতা, জনসাধারণ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে সহায়তা করতে হবে।

৯। **ছাত্রকল্যাণঃ**

(ক) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কর্মকর্তাদের জন্য একটি অফিস থাকবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে।

স্ত্রী-শিক্ষা

(Women's Education)

স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

(ক) কো-এডুকেশন্যাল কলেজে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) নারী ও পুরুষদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) সমাজে নাগরিক ও নারী হিসাবে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) কো-এডুকেশন্যাল কলেজে ছাত্রা যাতে সৌজন্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের উপযুক্ত শিক্ষা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) মহিলা শিক্ষকেরা একই প্রকার কাজের জন্য পুরুষ শিক্ষকদের সমান হারে বেতন পাবেন।

সংবিধান ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

(Constitutions and Control)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান ও নিয়ন্ত্রনব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই তালিকাভুক্ত বিষয় করতে হবে।

২। অর্থসংস্থান, জাতীয় নীতির রূপায়ণ, সুদক্ষ পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জাতীয় গবেষণাগারগুলির সংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য রাখবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী কমিশন স্থাপন করতে হবে।

৪। বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মঞ্জুরী কমিশনকে সাহায্য করবেন।

৫। নিছক অনুমোদনপ্রদানকারী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।

৬। সরকারী কলেজগুলিকে ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত (Constituent) কলেজে রূপান্তরিত করতে হবে।

৭। প্রাইভেট কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

(ক) তারা গ্রাণ্ট-ইন-এইড পাবার উপযুক্ত কিনা; এবং (খ) তারা ছাত্রদের আভ্যন্তরীন কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে সক্ষম কি না।

৮। কলেজের পরিচালক সমিতিকে (Governing body) যথাযোগ্যভাবে গঠন করতে হবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠন হবে নিম্নরূপ :

(ক) ভিজিটর (গভর্ণর-জেনারেল) ;

(খ) চ্যান্সেলার (প্রাদেশিক গভর্ণর) ;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলার (একজন সারাক্ষণের অফিসার) ;

(ঘ) সেনেট (কোর্ট) ;

(ঙ) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (সিণ্ডিকেট) ;

(চ) এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ;

(ছ) ফ্যাকাল্টিজ ;

(জ) বোর্ডস্ অব স্টাডিজ ;

(ঝ) ফিন্যান্স কমিটি ; এবং

(ঞ) সিলেকশন কমিটি সমূহ।

১০। প্রদেশগুলির জন্য একটি গ্রাণ্টস্ এ্যালোকেশন কমিটি গঠন করতে হবে।

অর্থসংস্থান

(Finance)

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংস্থান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। রাষ্ট্রকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।

২। প্রাইভেট কলেজগুলিকে বিল্ডিং, সাজসরঞ্জাম ও পৌনঃপুনিক ব্যয়ের (recurring expenditure) জন্য সাহায্য করতে হবে।

৩। শিক্ষাকার্যে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আয়কর সংক্রান্ত আইন সংশোধন করতে হবে।

৪। বর্তমান কমিশনের সুপারিশগুলিকে রূপায়িত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অধিক অর্থ মঞ্জুর করতে হবে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারকে বার্ষিক দশ কোটি টাকা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৬। অর্থ মঞ্জুরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালর মঞ্জুরী কমিশন গঠন করতে হবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ—

কমিশন বেনারস, আলিগড়, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, মহীশূর, পাটনা, ওসমানিয়া (হায়দ্রাবাদ), লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, অন্ধ্র, আগ্রা, আন্নামালাই, ত্রিবাঙ্কুর, উৎকল, সগর, রাজপুতানা, পূর্বপাঞ্জাব, গৌহাটি, পুণা ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দান করেন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রথমে অস্থায়ীভাবে সনদ (charter) প্রদান করবেন। পরে অস্থায়ী সনদের কার্যকাল শেষ হলে স্থায়ী সনদ মঞ্জুর করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। সমগ্র দেশের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা ক'রে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

(Rural Universities)

কমিশনের মতে বর্তমানে যেসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলি প্রধানত শহরের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও অনুরূপ উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Rural University) পরিকল্পনা করেন।

গ্রামের সমাজজীবন ও শহরের সমাজজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় গ্রামীন উচ্চশিক্ষা ও নাগরিক উচ্চশিক্ষার মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য থাকবে। শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের উপজীবিকা, শিক্ষার মান ও সামাজিক সমস্যার পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। যেখানে শহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, যন্ত্রশিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে থাকে সেখানে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করবে জনশিক্ষা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদানপদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিকল্পনা করার সময় গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। **কমিশন গ্রামীন শিক্ষার নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—**

১। আট বছরে উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর,

২। তিন বছরের কলেজ শিক্ষাস্তর, এবং

৩। দু বছরের এম. এ. শিক্ষাস্তর।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সমালোচনামূলক আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি নানাদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাকে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুনভাবে গড়ে তোলার যে দায়িত্ব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল কমিশন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। কমিশন বুঝেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার কোনরকম উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম তার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কমিশন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য দেশনেতা সৃষ্টি ও কারিগরি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষার মাধ্যমে তার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, কমিশন একথা ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য কমিশন সমাজের সকল মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার সমান সুযোগ প্রদান, দেশকে অনাহার, দারিদ্র্য, ব্যাধিও অজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের উপরও কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুরাতনের প্রতি অতিরিক্ত মোহকে কমিশন দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে যাতে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একধারে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন প্রকৃত দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

বস্তুতঃ নিছক বিদেশী শিক্ষার অনুকরণের দ্বারা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন করা যায় না। কমিশন এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সেইজন্য তাঁরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও যথাযথ মূল্য দিতে চেয়েছেন। আবার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন দর্শন, সাহিত্য বিষয়ক ও চারুকলামূলক শিক্ষার

অপরিহার্যতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যাতে মানুষ তার অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্খা ও আদর্শ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে কমিশন সুস্থ সবল ও উদারচেতা নাগরিক সৃষ্টির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন্।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যশিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন. পাঠক্রমের সংস্কার, পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি সময়োপযোগী এবং প্রশংসার যোগ্য। ছাত্র-অশান্তি দূরীকরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং ছাত্র-কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ণ করে কমিশন বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির ব্যাপারেও কমিশন সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিশাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর যৌথ দায়িত্ব আরোপ করে কমিশন যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমিশন এই শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ অসম্পূর্ণ ও দুর্বল বলে মনে হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার নির্দেশ দিলেও, কিভাবে এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন আলোচনা করেন নি। ফলে এ বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তীকালে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি এবং কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার ২০ বছর পরে আজও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ইংরাজীই থেকে গেছে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের সমাজজীবনের উন্নতির জন্য সেটি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। কিন্তু এ ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি যথেষ্ট বাস্তবধর্মী হতে পারেনি। গ্রামে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের যে স্বপ্ন কমিশন দেখেছিলেন তা অনেকাংশে ছিল কল্পনানির্ভর এবং গ্রাম্য জীবনের অন্যান্য হাজার রকমের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অবাস্তবও বটে। সেইজন্য কমিশনের ঐ স্বপ্ন আজ পর্যন্ত স্বপ্নই রয়ে গেছে।

———

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

বা

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট

(অক্টোবর, ১৯৫২—জুন, ১৯৫৩)

[সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

ভূমিকা : ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তার উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডঃ এ. লক্ষণ-স্বামী মুদালিয়র। তার নাম অনুসারে এই কমিশন মুদালিয়র কমিশন নামেও সুপরিচিত। ভারতবর্ষ ও বিদেশের ৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়।

কমিশনকে মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুলি সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয় :—

১। ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তার বিবরণ প্রদান।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নতি-সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা :

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, সংগঠন ও বিষয়বস্তু ;

(খ) প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্ক ;

(গ) বিভিন্নপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ; এবং

(ঘ) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যাদি।

কমিশনের উদ্দেশ্য (Raison d'etre of the Commission)

সংবিধান অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকার-গুলির। কিন্তু সমগ্র দেশের সংস্কৃতি ও কারিগরী নৈপুণ্যের উপর

মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা বিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল দেশের যুবকদের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা সামাজিক পুনর্গঠন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যুবকদের কি জাতীয় শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে স্বভাবতঃই আগ্রহশীল। মাধ্যমিক শিক্ষা যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী করে গড়ে তুলবে। তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষার যথাযোগ্য মান বজায় রাখার দায়িত্বও রয়েছে এই শিক্ষাস্তরের। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে লব্ধ যোগ্যতার মানের উপর উচ্চতর শিক্ষার মান বিশেষভাবে নির্ভর করে।

সর্বভারতীয় সমস্যা :

শিক্ষার ব্যাপারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সুস্পষ্ট নীতি নির্দ্ধারন করা প্রয়োজন। সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে কেন্দ্রের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি দায়িত্বশীল ও যৌথমনোভাবসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রবণতা লাভ করতে পারে। উপযুক্ত নাগরিক হতে হলে সামাজিক শিক্ষা এবং সঠিক মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দেশের ভাবী নাগরিকদের গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে এমন একটি সুষম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। সামাজিক গুণাবলী, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বাস্তব নৈপুণ্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার কাঠামো রচনা করতে হবে।

তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন ভাষার বিশেষতঃ হিন্দী ও ইংরাজীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করার প্রশ্নটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন এই বিষয়ে ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেছে। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য এই জাতীয় বিভ্রান্তি ও মতদ্বৈধ দূর করা দরকার। তাছাড়া সম্প্রতি প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমশ: মাথা চাড়া

দিয়ে উঠছে। সেইজন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদদেরও জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষা যদি এই সমস্ত প্রবণতাগুলিকে রোধ করার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে এবং জাতীয় সংহতি সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করতে না পারে তাহলে আমাদের স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। কমিশনের মতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং আংশিকভাবে অর্থনৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক দায়িত্ব বহন করা উচিত যেমন শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত অভীক্ষা প্রস্তুত করা, উন্নত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করা এবং কারিগর-শিক্ষণ (training of technicians)। তাছাড়া ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের ব্যাপারেও কেন্দ্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। প্রাদেশিক সরকার-গুলি একদিকে যেমন শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও সেগুলির প্রয়োগের ব্যবস্থা করবেন, অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার তেমনি দেশের অর্থনৈতিক, শিল্পগত (industrial), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে সমগ্রভাবে জাতীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে শিক্ষার সমস্যাটি বিচার করবেন এবং শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশন

ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা করার জন্য অতীতে অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, যথা—ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২), ১৯০২ সালের কমিশন, স্যাডলার কমিশন (১৯১৭) এবং রাধা-কৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮)। এই কমিশনগুলি প্রসঙ্গক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার কতকগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করেছিল। কিন্তু কোন কমিশনই ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য নিযুক্ত হয়নি। বর্তমান কমিশনের উপর এই দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্য কমিশন প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করে। মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন কাঠামোটি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় কিভাবে তা একদিকে

প্রাথমিক ও অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং কিভাবে শিক্ষাগ্রহণের সমগ্র ব্যাপ্তিকাল এই তিনটিস্তরের মধ্যে বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কমিশনগুলির অনেক সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন ছিল। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে আলোচ্য কমিশনের সুপারিশ-গুলি কার্যকরী করার দায়িত্ব জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। সেইজন্য কমিশন তার সুপারিশগুলি রূপায়িত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। কমিশনের সুপারিশগুলি যাতে বাস্তবে রূপদান করার উপযোগী হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং এইজন্য সুপারিশগুলিকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কমিশন একথা মনে করে যে তার কতকগুলি সুপারিশ সুদূর-প্রসারী নয়। কারণ সামাজিক, রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ কৌশলের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। আজ শিক্ষা সংক্রান্ত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, আগামীকাল তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। সেইজন্য একথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য নয়—একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এগুলি রচিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে মাঝে মাঝে এগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of Exsisting System)

কমিশনের নিকট অনেকে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটির উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে এই শিক্ষা অতিরিক্ত পরিমানে গ্রন্থ-কেন্দ্রিক এবং যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন এবং অত্যন্ত বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গতিপূর্ণ (**rigidly uniform**) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের বিভিন্ন রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতার যথাযথ পরিতৃপ্তি ঘটে না। এই শিক্ষার দ্বারা ছাত্রেরা সুনাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব, সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা পায় না। পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব, গুরুভার পাঠ্যসূচী, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, বস্তুগত সুখ-সুবিধার অভাব শিক্ষাকে শিশুদের নিকট রমণীয় করে তোলার পরিবর্তে বোঝায় পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র দেবার

জন্য একজাতীয় পাঠ্যতালিকার পরিকল্পনা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই অনুপযোগী। বহুমুখী পাঠ্যতালিকার অভাবের জন্য বহু ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর উপযুক্ত কর্ম সংস্থান করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁধাধরা সময় পত্রিকা, নিম্নমানের অনুপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং অযথা বিস্তারিত পাঠ্যসূচী শিক্ষকদের আত্মপ্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয় না কিংবা তাদের আত্মনির্ভরতারও বিকাশ ঘটে না এবং ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটে না। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের জন্য ঘনিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না এবং ছাত্রদের মন ও চরিত্রের উপর শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষাগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। বিগত কয়েক দশক ধরে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অনুন্নত গৃহপরিবেশ থেকে যে সব শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে উক্ত পরিবেশ তাদের বিদ্যাভ্যাসের অনুকূল নয়। এইসব শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করাও বর্তমানে বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাও উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষককে আকর্ষণ করতে পারছে না। শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথভাবে যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে না। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সার্থক বিকাশ সাধন, শারীরিক কল্যাণ এবং মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই কেবল শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন এবং আনন্দোজ্জ্বল ও সজীব পরিবেশ রচনার জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ, দলগত ক্রীড়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য চিত্তবিনোদনমূলক কাজকর্মের ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরও অসংখ্য ত্রুটির উল্লেখ করতে পারবেন। কমিশন বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক ত্রুটিগুলি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে উক্ত শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে সেগুলি সহায়তা করতে পারে।

প্রথমতঃ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে জীবনের কোন সংযোগ নেই। পাঠক্রম যেভাবে রচিত হয়েছে এবং যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে তা পরিবেশিত হচ্ছে তাতে ছাত্রেরা তাদের জাগতিক পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ

করার পর তারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না এবং সমাজে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্থান করে নিতে পারছে না। বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং বহির্জগতের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হলে এই অবস্থা দূর করা যাবে না। **দ্বিতীয়তঃ** এই শিক্ষা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী এবং ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। বহু দশক ধরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দিয়ে আসছে। যার অর্থ হল কতকগুলি বিষয়ে কিছু তথ্য সরবরাহ করা কিংবা লিখন ও পঠনের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বহির্ভূত দিকগুলি (non-cognitive aspects)—তার বাস্তবধর্মী প্রবণতা, প্রক্ষোভ, রসাস্বাদন (appreciation), রুচি, প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উপেক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের কার্যসূচীতে খেলাধূলা, হাতের কাজ (crafts) এবং কিছু কিছু সামাজিক কাজকর্ম স্থানলাভ করলেও, সেগুলি পাঠক্রমের অচ্ছেদ্য অংশ নয়। মোটকথা, শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র প্রচলিত শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। **তৃতীয়তঃ**, অল্প কিছুদিন পূর্বেও ইংরাজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি আবশ্যিক বিষয়। তার ফলে যথেষ্ট ভাষাগত সামর্থ্য না থাকলে পড়াশুনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। একজন ছাত্র ইংরাজীতে অকৃতকার্য হলে স্কুল ফাইনালও পাশ করতে পারত না এবং কোন সরকারী চাকরীও পেত না। অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হত না। **চতুর্থতঃ** প্রচলিত শিক্ষাদানের পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না কিংবা তারা কর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শেখে না। তারা সহযোগিতামূলক সাফল্যের আনন্দের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাফল্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে শেখে। ছাত্রদের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাঠ দান করা হয় এবং তারা অনিচ্ছা সহকারে সেগুলি মুখস্থ করে। **পঞ্চমতঃ**, শ্রেণীগুলিতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে চরিত্রগঠনের শিক্ষা কিংবা প্রকৃত শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি কোনটিই সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া শিক্ষকদের সাধারণ যোগ্যতাও হ্রাস পেয়েছে; তাঁদের অর্থ নৈতিক অস্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদার অভাবের জন্য তাঁদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যোগ্যতা

বৃদ্ধি, সন্তোষ উৎপাদন এবং আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করতে না পারলে তাঁরা তাঁদের কাজে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারবেন না। পরিশেষে পরীক্ষার জগদ্দল পাথর শিক্ষকের উদ্যোগকে খর্ব করেছে, পাঠক্রমকে একঘেয়ে করেছে, শিক্ষণ পদ্ধতিকে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ করেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার সমস্ত উৎসাহ নষ্ট করেছে এবং শিক্ষার ভ্রান্ত অথবা মূল্যহীন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা কমিশন একথা প্রমাণ করতে চান না যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সব কিছুই খারাপ কিংবা এই শিক্ষা জাতীয় জীবনে কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। ভ্রান্ত এবং সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে এর সূত্রপাত হয়েছিল এবং সেটাই ছিল এর সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। স্বভাবতই এই সীমাবদ্ধ উদ্দ্যেশ্যের মধ্যেই পরবর্ত্তী কালে এই শিক্ষার কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড সংস্কার ও উন্নতি ঘটেছে। ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ঐ সব সংস্কারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। বর্ত্তমানে বলিষ্ঠ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন যাতে ঐ সব পৃথক পৃথক সংস্কারগুলি (reforms) সুসংহতভাবে এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Secondary Education)

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজন ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং অগ্রগতির প্রত্যেকটি স্তরে শিক্ষার আশু উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা পুনর্বিবেচনা করে দেখা এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন। উপরন্তু এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করার সময় কেবল বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলেই চলবে না, দেশের ক্রমোন্নতির গতিপ্রকৃতি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের পরিকল্পনার কথাও চিন্তা করতে হবে যাতে শিক্ষা তার সহায়ক হতে পারে।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শিক্ষাগত প্রয়োজন (Educational Needs of Democratic India)

শিক্ষার দিক থেকে প্রাথমিক এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেসব ঘটনার কথা বিবেচনা করতে হবে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং বিশেষভাবে বিবেচনা করার পর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করেছে। এর অর্থ হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এদেশের অধিবাসীরা যাতে যোগ্যতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং উদার, জাতীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্তরায় সমস্ত বিভেদমূলক শক্তি কে প্রতিহত করতে পারে তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে এবং চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও, বর্তমানে এদেশ দরিদ্র। এ দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অমানবিক জীবন যাপন করতে হয়। এ দেশের অন্যতম জরুরী সমস্যা হল—উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানো, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং জীবনযাত্রার মানকে যথাসম্ভব উন্নত করা। তৃতীয়তঃ, আংশিকভাবে ব্যাপক দারিদ্র্যের চাপে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। জনগণের একটা বিরাট অংশ কোনমতে জীবিকা অর্জনের চিন্তায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষাব্যবস্থার এমন ভাবে স্বাদেশীকরণ (reorientation) করতে হবে যাতে তা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলির উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করতে হবে—আমাদের যে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে তাতে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে ছাত্রেরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই অনুযায়ী তাদের চরিত্র গঠন করা; দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে তারা যাতে যোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারে তার জন্য তাদের ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, ছাত্রদের আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তাদের সাহিত্যিক শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রহের বিকাশ

সাধন করা; এ ছাড়া প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না উপরোক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বোঝাবার জন্য কমিশন সংক্ষেপে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গণতান্ত্রিক নাগরিকতার বিকাশ সাধনে শিক্ষার ভূমিকা (Role of education in Developing Democratic Citizenship)

গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি নাগরিককে নাগরিকের যথাযোগ্য দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ করে তুলতে হবে। এর অর্থ হল বিভিন্নপ্রকার বৌদ্ধিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশসাধন, এই সকল গুণাবলী নিজে থেকেই বিকশিত হয় না। গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্নপ্রকার জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীন বিচারশক্তি প্রয়োগ করে নিজের কার্যপ্রণালী নির্ণয় করতে হয়। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তিতে অধিকাংশ নাগরিকের বিধিবদ্ধ শিক্ষার (formal education) শেষ হয়, সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হল স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করার ক্ষমতার বিকাশ সাধন। ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়কে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, কারণ এটি হল শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতার মাপকাঠি। যে গণতন্ত্রে জনগণের স্বচ্ছ বিচারশক্তির বিকাশ ঘটেনি তার অগ্রগতি ও অস্তিত্বরক্ষা দুইই অসম্ভব, কারণ সে ক্ষেত্রে তার পদে পদে বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের গণসংযোগ ও প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম করায়ত্ব থাকায় সহজেই তারা জনগণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের সত্য-মিথ্যা বিচার করা, বাস্তব সত্য ও প্রচারমূলক সত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, অন্ধ গোড়ামি ও কুসংস্কারের আবেদন অগ্রাহ্য করার মত শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। তাকে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে যাতে সে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে পারে। তার মন নতুন চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং সে বর্তমানে অচল ধ্যান-ধারণা, ও রীতিনীতির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। যা কিছু পুরাতন তাকেই বর্জন করতে হবে এবং যা কিছু নতুন তাকেই গ্রহণ করতে হবে এ

মনোভাব নয়—তার পরিবর্ত্তে উভয়কেই নিরাসক্তভাবে বিচার বিবেচনা করে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রগতি ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী যা-কিছু তা বর্জন করতে হবে। এই জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাদের একথা বুঝতে হবে যে সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষে তারা যে ধরনের শিক্ষা দেন তাতে ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয়ভাবে পাঠ্য বিষয় গলাধঃকরন করে মাত্র, উপরে বর্ণিত মানসিক যোগ্যতা অর্জনে তা মোটেই সাহায্য করে না।

চিন্তাধারার স্বচ্ছতার সঙ্গে কথন ও লিখনের স্পষ্টতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এটি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদই নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্থকভাবে জীবনযাপন করতে হলে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, কারণ গণতন্ত্র স্বাধীন আলোচনা, প্ররোচনা ও শান্তিপূর্ণ মত বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—বলপ্রয়োগের উপর নয়। অন্যকে প্রভাবিত ক'রার জন্য এবং হিতকর জনমত গড়ে তোলার জন্য একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কথাবার্তা ও লেখার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে হবে।

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের উপর বিশ্বাসই গণতন্ত্রের ভিত্তি। মানুষের এই সহজাত যোগ্যতাকে অর্থ নৈতিক, জাতিগত কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তির বিচারে খর্ব করা যায় না। সেইজন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। এর জন্য শিক্ষাকে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক ও ব্যবহারিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে জীবনধারণের ব্যাপক প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত হবে—অর্থাৎ শিক্ষা ছাত্রদের সার্থক, সমাজজীবন যাপন করার বহুমুখী কৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে। একথা খুব সত্য যে কোন ব্যক্তি একাকী বসবাস করতে বা ক্রমবিকাশ লাভ করতে পারে না। ব্যক্তির ক্রমোন্নতি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে অন্যের সঙ্গে বসবাস করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে অবাধ আদান প্রদানের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষাকে সমষ্টিগত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। এই সকল গুণাবলী হল নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline), **সহযোগিতা** (co-operation), **সামাজিক সংবেদনশীলতা** (social sensitiveness) এবং **সহিষ্ণুতা** (tolerance)। সমষ্টিগত কাজে

সাফল্যের জন্য নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতার অভাবে ব্যক্তি যেমন কোন যৌথ কাজ সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে না, তেমনি তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতারও বিকাশ ঘটে না।

মাধ্যমিক শিক্ষায় নতুন সাংগঠনিক কাঠামো (New organisational Pattern of Secondary Education)

১। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চার অথবা পাঁচ বছরের প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হবে এবং এতে (ক) তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য অথবা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর থাকবে এবং (খ) চার বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থাকবে।

২। অন্তবর্তীকালীন সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিত্থালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্থালয়গুলি একই সঙ্গে চলতে থাকবে এবং প্রথমোক্ত বিত্থালয়গুলির উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে যাতে সেগুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্থালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে।

৩। বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট স্তরের স্থান গ্রহণ করবে মাধ্যমিক স্তর। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের স্থিতিকাল হবে ৪ বৎসর ; ইন্টারমিডিয়েট স্তরের এক বৎসর এর সঙ্গে যুক্ত হবে।

৪। উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিত্থালয়ের প্রথম ডিগ্রি কোর্সের স্থিতিকাল হবে ৩ বৎসর।

৫। যারা উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষা পাশ করবে তাদের বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক বছর প্রাক্-বিশ্ববিত্থালয় কোর্স অধ্যয়ন করতে হবে।

৬। যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কিংবা প্রাক্ বিশ্ববিত্থালয় পরীক্ষা পাশ করেছে তারাই কেবল বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে।

৭। বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে এক বছরের প্রাক্-বৃত্তিমূলক কোর্স (pre-professional) চালু করতে হবে।

৮। ছাত্রদের বিভিন্ন প্রবণতা, সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী যাতে তারা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সুযোগ পায় সেইজন্য সম্ভবমত সকল স্থানেই বহুমুখী বিত্থালয় স্থাপন করতে হবে।

৯। যারা এইভাবে যোগ্যতার সঙ্গে বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষাগ্রহণ করবে তাদের পলিটেকনিক কিংবা কারিগরী শিক্ষায়তন ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (Technological Institutions) বিশেষধর্মী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

১০। প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামীন বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষার বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

কারিগরী শিক্ষা (Techinical Education) :—

১১। পৃথকভাবে কিংবা বহুমুখী বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে অধিক সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় খুলতে হবে।

১২। কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি বড় বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন মেটাবে।

১৩। যেখানে সম্ভব সেখানে উপযুক্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির সন্নিকটে কারিগরী বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করতে হবে এবং ঐ শিল্পকেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সেগুলি পরিচালিত হবে।

১৪। ঐ শিল্পকেন্দ্রগুলি যাতে ছাত্রদের শিক্ষানবিসির সুযোগ দেয় তার জন্য আইন সম্মত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১৫। সর্বস্তরের কারিগরী এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনার ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে তাঁরা ঐ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

১৬। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্পগুলির উপর "শিল্প শিক্ষা কর" (Industrial Education cess) ধার্য করতে হবে।

১৭। মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষার উপযোগী কোর্স প্রবর্তন করার জন্য কারিগরী শিক্ষার সর্বভারতীয় সংসদ ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য বিদ্যালয় :—

১৮। বর্তমানে যে সমস্ত পাবলিক স্কুল আছে সেগুলি চলতে থাকবে এবং সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে জাতীয় শিক্ষার সাধারণ কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। এইরূপ বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমশঃ

আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে এইসব বিদ্যালয়গুলিকে দেয় প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে।

১৯। এইসব বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দেবেন।

২০। কোন কোন গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে, পিতা মাতার কাজে সাহায্য করার জন্য যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হয় তারা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেতে পারে।

২১। ঘনিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, এবং চিত্তবিনোদন ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্য্যাবলীর (extra-curricular activities) সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য উপযুক্ত স্থানে আবাসিক দিবা বিদ্যালয় (Residential Day School) স্থাপন করতে হবে।

২২। অনগ্রসর শিশুদের (handicapped children) চাহিদা পূরণ করার জন্য অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

সহ-শিক্ষা (Co-education) :—

২৩। ছেলে ও মেয়েদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হবে; তবে মেয়েদের স্কুলে এবং যেখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দিতে হবে।

২৪। যেখানে মেয়েদের স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে প্রাদেশিক সরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল খোলার চেষ্টা করতে হবে।

২৫। সহ শিক্ষামূলক কিংবা মিশ্র বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের এবং শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা
(Study of Languages)

কমিশন বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদও রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম

ভাষার অস্তিত্বের জন্ম সমগ্র ভারতবর্ষে একই প্রকার ভাষানীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। অনেকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একটি ভাষা থাকা উচিত যা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সকল লোকের পক্ষে বোধগম্য এবং যেহেতু হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেইজন্য বাধ্যতামূলক-ভাবে ঐ ভাষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা উচিত।

কমিশনের মতে নিম্নলিখিত ৫টি ভাষা সম্পর্কে আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে—(১) মাতৃভাষা; (২) আঞ্চলিক ভাষা (যখন ইহা মাতৃভাষা নয়; (৩) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা; (৪) সংস্কৃত, আরবী, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; এবং (৫) আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজী। রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমগ্র দেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—(১) হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল; (২) যে অঞ্চলের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, অথচ প্রচুর সংখ্যক লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলে; (৩) অ-হিন্দীভাষী অঞ্চল।

বিভিন্ন ভাষা ও সংবিধান :—

সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে তা হল, "ভারত যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হবে হিন্দী এবং সংবিধান চালু হওয়ার পর ১৫বছর পর্যন্ত ইংরাজী পূর্বের ন্যায় সমস্ত সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হতে থাকবে।" সংবিধানে একথাও বলা হয়েছে যে উক্ত ১৫ বছরের পরেও লোকসভার অধিকাংশ ভোটের সাহায্যে ইংরাজীর ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখা যাবে। সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় বলা হয়েছে, "প্রাদেশিক আইনসভা আইন প্রণয়ন করে প্রদেশে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা কিংবা হিন্দী ভাষাকে সেই প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।" "বর্ত্তমানে কেন্দ্রে যে সরকারী ভাষা ব্যবহৃত হবে সেই ভাষাতেই দুইটি প্রদেশের মধ্যে কিংবা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের কাজ চলবে, তবে প্রদেশগুলি যদি হিন্দী ভাষা ব্যবহার করতে রাজী হয় তাহলে হিন্দী যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোন রাজ্যের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ তাদের কথ্য ভাষাকে রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃতি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করছে তাহলে তিনি ঐ ভাষাকে রাজ্যের সর্বত্র কিংবা কোন একটি অংশে স্বীকৃতি-দানের নির্দেশ দিতে পারেন।" সংবিধানের বিশেষ নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে যে হিন্দী ভাষার প্রসার ও উন্নতিবিধানের জন্য কেন্দ্রকে চেষ্টা করতে

হবে যাতে ঐ ভাষা ভারতবর্ষের মিশ্র (composite) সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রকাশের মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে।

সংবিধানের উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে সংবিধান রচয়িতাদের সামনে দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার জন্য হিন্দী ভাষা ব্যবহার করবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যও হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দী যাতে ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রকাশের মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে তার জন্য ঐ ভাষার উন্নতিসাধন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দী শিক্ষার অবস্থা :—

কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন রাজ্যগুলি বিদ্যালয়ে স্তরে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি হল—(১) কতকগুলি রাজ্যে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক, তাছাড়া সেখানে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমও হিন্দী ; (২) কোথাও হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক এবং পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হল আঞ্চলিক ভাষা ; (৩) কোন কোন স্থানে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক, কিন্তু পরীক্ষার সময় হিন্দী-পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয় না : এবং (৪) কোন কোন রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ছাত্রদের সেটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ করতে হয় এবং এই বিষয়ে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না।

বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার অবস্থা :—

১৯৩৭ সালের পূর্বে অধিকাংশ রাজ্যে ইংরাজী যে কেবল একটি আবশ্যিক বিষয় ছিল তাই নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তখন ছাত্রদের দুটি ভাষা শিক্ষা করতে হত—ইংরাজী এবং মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা একটি প্রাচীন ভাষা। বর্তমানে সকল রাজ্যেই শিক্ষার মাধ্যম হয় মাতৃভাষা না হয় আঞ্চলিক ভাষা। অবশ্য সর্বত্রই মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী একটি আবশ্যিক বিষয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে (১) যে সব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা

ইংরাজী সেখানে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম রাখা হয়েছে ; (২) যে সব ছাত্রকে নানা কারণে স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয় এবং যারা সহজে নতুন আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত করতে পারে না তাদের সুবিধার জন্য কোন কোন বিত্থালয়ে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষনীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা শিক্ষার অবস্থা :—

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (The Central Advisory Board of Education) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জুনিয়র বেসিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। যেখানে মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা থেকে পৃথক সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য বিত্থালয়ে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্বে আঞ্চলিক বা রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা দেওয়া চলবে না, তবে জুনিয়র বেসিক স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম, তবে জুনিয়র বেসিক স্তরের পর যাতে ছাত্রেরা যাতে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রথম দুবছর তারা ইচ্ছা করলে মাতৃভাষায় উত্তর দানের সুযোগ পাবে। যদি কোন অঞ্চলে আঞ্চলিক কিংবা রাষ্ট্র ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা-ভাষী যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র থাকে তাহলে তাদের জন্য পৃথক বিত্থালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিত্থালয় স্থাপনের সুযোগ পায় এবং আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে তাদের প্রতি যাতে কোনরূপ অবিচার না করা হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য :—

মাধ্যমিক বিত্থালয়ে ছাত্রদের কতগুলি ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় এবং কোন কোন স্তরে এই সব ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত—কমিশনের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অনেকে এই সব ভাষা শিক্ষার দ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাও বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। কমিশনও একথা

স্বীকার করেন। শিশু যখন শিক্ষা সুরু করে তখন মাতৃভাষাই যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম একথা সকলেই স্বীকার করেন। অনেক বিদেশী ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সে রকম ব্যবস্থা যদি আঞ্চলিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হত তাহলে শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য হত। আঞ্চলিক ভাষা একটি অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয় বলে ঐ ভাষা শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। যে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা করা যাবে না তাদের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই পড়াশুনা করতে হবে।

হিন্দীর স্থান :—

যেহেতু সংবিধানে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেইজন্য হিন্দী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কেন্দ্র ও রাজগুলির মধ্যে সকলপ্রকার যোগাযোগ রক্ষার জন্য হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হবে এবং যেহেতু বহু সংখ্যক লোক এই ভাষায় কথা বলে সেইজন্য সরকারী কাজকর্ম ছাড়াও অন্যান্য প্রকার যোগযোগের ব্যাপারেও এই ভাষা ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ আশা করা যাচ্ছে যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হবে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে যারা হিন্দী শিখবে না তারা ভবিষ্যতে চাকরীও লাভ করতে পারবে না এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করতে পারবে না। হিন্দীর মত একটি অধিক প্রচলিত ভাষা যদি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়। অবশ্য অনেকে একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে একাধিক ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইংরাজীর স্থান :—

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ইংরাজীর স্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজী এমন একটি ভাষায় পরিণত হয়েছে যা আমাদের

দেশের শিক্ষিত লোকেদের নিকট পরিচিত। কমিশনের কাছে অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। তাদের মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বর্তমানে যে স্থান লাভ করেছেন তারজন্য শিক্ষিত ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষার উপর দখল আংশিকভাবে দায়ী। সেইজন্য অনেক প্রখ্যাত শিক্ষা-বিদ ও বৈজ্ঞানিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজী ভাষা চর্চ্চার দ্বারা আমরা যে নানাবিধ সুবিধা লাভ করেছি কোন মতেই তা আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না, বরং আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের দেশের যুবকেরা সকল ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে। এর জন্য ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। অপর পক্ষে অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ভারতর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করলে একটি বিদেশী ভাষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারটি অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাঁরা অতীতে ইংরাজীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং তার ফল স্বরূপ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষা ও বিষয়গুলিকে অবহেলা করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের মতে নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান সম্পর্কে আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তাঁরা শিশুর শিক্ষালাভের প্রথম ৭/৮ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাদানের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করেন।

প্রাচীন ভাষা সমূহের স্থান ঃ—

সকল দেশেই শিক্ষিত লোকেদের কিছু অংশ প্রাচীন ভাষাগুলির প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী সংস্কৃতের প্রতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে প্রচুর সংখ্যক ভারতবাসী শ্রদ্ধা পোষণ করেন। বর্ত্তমানে ভাষা শিক্ষা নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে প্রাচীন ভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। প্রাচীন ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা

শিক্ষা একেবারেই লোপ পাবে। সেইজন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দান করতে হবে। অন্যান্য সকল প্রাচীন ভাষার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। বিদ্যালয় স্তরেই এই সকল ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তা না হলে পরবর্তী স্তরে এই ভাষাগুলি শিক্ষা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে না।

বিদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার অবস্থা :—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দেওয়ায় কমিশন বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছেন।

ফ্রান্সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বত্রই ইংরাজী ও জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত এই বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং এই ভাষার একটি পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জাপানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ইংরাজী ভাষা আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বার্লিন ও হামবুর্গে দশ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মিশরের বিদ্যালয়গুলিতে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা বাধ্যতা-মূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর এই দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় মিড্‌ল স্কুল (Middle School) ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক-ভাবে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে হয়। সেখানকার বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান ও স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইরাণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে রাশিয়ান, ফরাসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সুইডেনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষনীয় প্রথম বিদেশী ভাষা হল ইংরাজী। সেখানে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর অনেক দেশেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সুযোগ্য শিক্ষক ও উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা :—

ভাষা শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে সুযোগ্য শিক্ষক এবং বিভিন্ন

স্তরে কি ধরনের সাহিত্য ছাত্রকে পড়তে দেওয়া হচ্ছে তার উপর। বর্তমানে স্কুল ও কলেজে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ইংরাজী শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরাজী শিক্ষার মানের অবনতির এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অবশ্য জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার মানের অবনতির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করছেন না বলেও ইংরাজী শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না।

অনুরূপভাবে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে এই অভাব বিশেষ প্রকট। সেখানে অনেকক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে এই ভাষা শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে দেখা যায়।

কমিশনের মতে সকল প্রকার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই উন্নত ধরনের শিক্ষা-দান পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরজন্য ভাষা শিক্ষকদের যথোপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া সুযোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী বই রচনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে।

উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে মহৎ সাহিত্য (classics) পাঠে উৎসাহ দান করতে হবে। এই সব সাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ ও আসক্তির সৃষ্টি হতে পারে। অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এই যে কিছু সংখ্যক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ ভাষাগুলি শিক্ষা করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত :—

ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত পর্যা-লোচনা করে এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কমিশন এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে হবে এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে এই ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হবে।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ

করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে এই ভাষা শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(গ) যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের ইংরাজী ভাষার এ্যাড্ভান্সড কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) নিম্ন মাধ্যমিক বা সিনিয়র বেসিক স্তরে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ছাত্রেরা যাতে এই ভাষা বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে এই ভাষা ব্যবহার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) যে সব ছাত্র প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করতে ইচ্ছুক, উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে তাদের ঐ ভাষা শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(ছ) বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রকে তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। বাল্যকাল ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সিনিয়র বেসিক স্তরে ছাত্র মাতৃভাষায় কিছুটা জ্ঞান অর্জন করার পর, হিন্দী ও ইরোজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে একই বছরে এই দুটি ভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ করা চলবে না। এক বছরের ব্যবধানে এই দুটি ভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ করতে হবে।

(জ) নিম্ন মাধ্যমিক বা সিনিয়র বেসিক স্তরের শেষে ছাত্র তার ইচ্ছামত হিন্দী বা ইংরাজী যে-কোন একটি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে এবং উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সে ইচ্ছা করলে একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করতে পারবে। উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষা নির্বাচনের ভার ছাত্রের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

(ঝ) বর্ত্তমানে হিন্দী কিংবা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইয়ের অভাব থাকায় এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় বর্ত্তমানে ইংরাজী ভাষায় ছাত্রেরা যাতে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংক্ষিপ্তসার :—

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে সাধারণভাবে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ সুযোগসুবিধা দিতে হবে।

২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে দুটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। একই বছর দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হবে না—এই নীতি অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বা জুনিয়র বেসিক স্তরের পর ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তার মধ্যে একটি হবে হয় মাতৃভাষা না হয় আঞ্চলিক ভাষা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম

(Curriculum in Secondary Schools)

বিগত কয়েক দশক ধরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠক্রমের কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। এই সমালোচনার মূল বক্তব্য হল :

১। বর্ত্তমান পাঠক্রম সঙ্কীর্ণভাবে পরিকল্পিত ;

২। ইহা গ্রন্থকেন্দ্রিক এবং তত্ত্বমূলক ;

৩। ইহা বিষয়বস্তু ভারাক্রান্ত হলেও এতে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অভাব আছে।

৪। এতে সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক ও অন্যান্য কাজকর্মের সুযোগ খুবই অপর্যাপ্ত।

৫। প্রাপ্ত যৌবনদের চাহিদা ও সামর্থ্যের খোরাক এতে নেই।

৬। এই পাঠক্রম অতিমাত্রায় পরীক্ষা-শাসিত ;

৭। এতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই, অথচ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশে অংশ গ্রহণ করার জন্য ছাত্রদের এই বিষয়গুলি শিক্ষা করা দরকার।

পাঠক্রম সম্পর্কে সঙ্কীর্ন ধারণা :—

কমিশনের মতে উপরোক্ত সমালোচনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে বর্তমান পাঠক্রম লক্ষ্যহীন একথা বলা চলে না। কেবল কলেজীয় শিক্ষার উপযোগী করে ছাত্রদের গড়ে তোলার জন্য এই পাঠক্রম সঙ্কীর্ণভাবে পরিকল্পিত একথা ঠিক। একসময় মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে যে পরীক্ষা নেওয়া হত তার নাম ছিল "প্রবেশিকা পরীক্ষা"। এই নামের মধ্যেই ঐ শিক্ষার লক্ষ্য নিহিত ছিল। পরবর্ত্তী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্বারাও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত।

বর্ত্তমানে "মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা" বা "স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা" এই নামকরণের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তনও কিছুটা সূচিত হচ্ছে। কিন্তু কার্যত এই শিক্ষার স্বরূপ বিশেষ বদলায় নি। ভারতবর্ষে এখনও কলেজীয় শিক্ষার দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া সরকারী চাকরীতে লোক নিয়োগের বর্ত্তমান পদ্ধতিও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীর জন্য আবেদন করার সর্ব্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৫ বছর হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করতে হচ্ছে এবং এইভাবে অর্থ ও শ্রমের অযথা অপচয় ঘটছে।

পুঁথিগত বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ :—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উপর কলেজের পাঠক্রম অধিক প্রভাব বিস্তার করায় প্রথমোক্ত পাঠক্রম অহেতুকভাবে গ্রন্থকেন্দ্রিক ও তত্ত্বমূলক হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম স্বভাবতঃই তত্ত্বমূলক। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠক্রম স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিমূর্ত্ত তত্ত্ব ও সাধারণীকরণ নিয়ে চর্চ্চা করার মতো বুদ্ধির পরিপক্বতা ঘটেনি। তা ছাড়া এইসব ছাত্রদের একটি বৃহৎ অংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয়। বস্তুতঃ সাধারণ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর অধিকাংশ ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়। সঙ্কীর্ণভাবে পরিকল্পিত পুঁথিগত পাঠক্রম এইসব ছাত্রদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারে না। এইসব ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার বৌদ্ধিক ও শারীরিক কাজকর্মে অংশ-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন এবং বিভিন্ন পেশাগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। এ গুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার চর্চ্চার দ্বারা লাভ করা যায় না। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এই সত্য উপলব্ধি করার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এসেছে। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে পাঠক্রমের কর্মপরিধি যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সেখানে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল ছাত্রের বৌদ্ধিক, শারীরিক, প্রক্ষোভমূলক, সৌন্দর্যবিষয়ক ও সামাজিক আগ্রহ ও সামর্থ্যের বিকাশসাধন। ছাত্রের সামগ্রিক বিকাশের জন্য তাকে বিভিন্নপ্রকার কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার ও

নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রকে হাতেকলমে জীবনযাপনের কৌশল শিক্ষা দিতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষা যে কেবল ছাত্রের জীবিকা অর্জনের জন্যই প্রয়োজনীয় তা নয়, এর সাহায্যে তাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠবে। বর্ত্তমানে পাঠক্রমের উপর বিভিন্ন বিষয়ের যে অতিরিক্ত গুরুভার রয়েছে তা হ্রাস করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে না শিখিয়ে এদের "সমাজবিদ্যার" অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে শেখালে সুফল পাওয়া যাবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে পৃথকভাবে শেখালে ছাত্ররা কিছু কিছু তথ্য ও বিভিন্ন সূত্র শিক্ষা করার সুযোগ পেলেও জগৎ সম্পর্কে বাস্তবধর্মী জ্ঞান তারা অর্জন করতে পারে না। পাঠক্রম রচনা করার সময় এই দুটি ধারার **(approach)** পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

বর্ত্তমানে প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যসূচীকে অতিরিক্ত তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করার একটা প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। পাঠক্রম রচয়িতারা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও গ্রহণক্ষমতা অপেক্ষা নিজেদের পছন্দ অপছন্দের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু যখন ছাত্রেরা যোগ্যতার সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারবে এবং এর সাহায্যে যখন তাদের জীবনের উন্নতি ঘটবে কেবল তখনই এই বিষয়বস্তুকে যথার্থ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কমিশনের মতে যতক্ষণ না বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় হতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং ছাত্রদের আগ্রহসৃষ্টিকারী তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ পাঠক্রম শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম হতে পারে না। এই জাতীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনের ভার বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সুযোগ্য ও অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য কমিশন বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে কতকগুলি বোর্ড গঠন করার সুপারিশ করেছেন। এই বোর্ডের কাজ হবে ছাত্রদের আগ্রহ ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য সুপারিশ করা।

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ছাত্রদের সকল প্রকা[র] তথ্য, এমন কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও শিক্ষা দেওয়া সবসময় সম্ভবও ন[য়] এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। বর্তমানে যে গুরুভার ও অনুপযোগী পাঠক্রম প্রচলি[ত]

আছে তার জন্য এইরূপ অবিবেচনা প্রসূত ইচ্ছাই দায়ী। ছাত্রদের স্মৃতিকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত না করে তার মধ্যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রের মধ্যে এইরূপ আগ্রহ সৃষ্টি হলে সে নিজেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবে। শিক্ষকদের একথা মনে রাখা দরকার যে বিদ্যালয় অথবা কলেজের পাঠ্যসূচী শেষ করলেই ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না—ছাত্রের শিক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে। কমিশনের মতে "Even a little knowledge, acquired pleasantly and thoroughly and with the feeling that it has real significance for us, is better than a great deal of miscellaneous, ill-digested knowledge unrelated to life. The former will quicken interest and open the gateway to continuous learning; the latter may kill curiosity and create distaste for further learning. In organizing our curricula and selecting methods of teaching, we must not lose sight of their crucial principle."

ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি উপেক্ষা :—

যৌবনাগমে ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিরুচি, আগ্রহ ও বিশেষ বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়, কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমে এইসব ব্যক্তিবৈষম্যের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় না। ১৩ বছর বয়স থেকে ছাত্রদের মধ্যে এই বৈষম্য দেখা দিতে থাকে এবং এর যথেষ্ট শিক্ষাগত তাৎপর্য রয়েছে। ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার সামর্থ্যকে শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। ইংলণ্ডে ছাত্রদের সামর্থ্যকে প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক (academic), কারিগরি ও ব্যবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ ক'রে সেই অনুযায়ী গ্রামার, টেকনিক্যাল ও মডার্ন এই তিন প্রকার মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কয়েকটি রাজ্যে ছাত্রের বিভিন্ন সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক কোর্স চালু করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বর্তমান পাঠক্রমে এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই ছাত্রেরা লেখাপড়া ও বিভিন্নপ্রকার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যাতে তাদের নানারূপ সামর্থ্যকে বিকশিত করার সুযোগ পায় পাঠক্রমে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরীক্ষাসমূহের প্রভুত্ব :—

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরীক্ষার দ্বারা শাসিত। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলকেই এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে। **(অন্যত্র শিক্ষার উপর পরীক্ষার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।**

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব :—

দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ করা হচ্ছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। এইজন্য ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ব্যবহারিক, প্রাক-কারিগরি ও প্রাক্-বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। এর কারণ হল শিল্পের প্রসারের উপর কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এই অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে ভারতবর্ষে দ্রুত গতিতে শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফলে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রেরা যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি :—

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতিগুলি কি হওয়া উচিত তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে। **প্রথমত** একথা মনে রাখা দরকার যে আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে পাঠক্রম বলতে কেবল বিদ্যালয়ে গতানুগতিকভাবে যে সব তত্ত্বমূলক (academic) বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলিকে বোঝায় না; অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, লাইব্রেরীতে, বীক্ষণাগারে খেলার মাঠে এবং ছাত্র-শিক্ষকের মেলামেশার মধ্য দিয়ে ছাত্র যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সব কিছুই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে বিদ্যালয়ের সমগ্র জীবনযাত্রাই

হচ্ছে পাঠক্রম এবং এর মধ্য দিয়েই ছাত্রের সুসম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি সুবিচার এবং ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহের পরিতৃপ্তির জন্য পাঠক্রম হবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং স্থিতিস্থাপক (elastic)। যে সমস্ত বিষয় শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়, জোর করে তাদের উপর সে সব বিষয় চাপিয়ে দিলে তাদের মধ্যে হতাশাবোধ দেখা দেবে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। অবশ্য যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য, পাঠক্রমে সেগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সকলের কাছ থেকে একই ধরণের সাফল্য প্রত্যাশা করলে চলবে না। তৃতীয়ত, পাঠক্রম সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে যাতে ছাত্র সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে পারে এবং সমাজের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে আসতে পারে। এর অর্থ হল উৎপাদন মূলক কাজকর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা, কারণ এই ধরণের কাজকর্মই হল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবজীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। শিক্ষাদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠক্রম নির্দ্ধারিত করে দেবেন, কোন বিদ্যালয় স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তার সঙ্গে নতুন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে। শিক্ষক ছাত্রের মনে এই বোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন যে বিদ্যালয় হল স্থানীয় জনজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যেও যাতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চতুর্থত, পাঠক্রমে ছাত্রদের অবসর বিনোদনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক, সৌন্দর্যমূলক ও খেলাধূলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমত, পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে চলবে না। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যাতে পরস্পর সম্পর্ক থাকে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিষয়বস্তু যাতে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মধ্যবর্তী বিদ্যালয় স্তর (Middle School Stage) বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পাঠক্রম :—

১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এর

পরবর্ত্তী স্তর হল তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৬ বছর), এবং চার বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৭ বছর)।

নিম্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পাঠ্যসূচী ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে যথাসম্ভব সাদৃশ্য থাকবে। যেহেতু এই স্তর ও প্রাথমিক স্তরের মধ্যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেইজন্য এই স্তরের পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি পূর্ববর্ত্তী স্তরের সঙ্গে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধানত কর্মকেন্দ্রিক হওয়ায় নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেও বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের উপর জোর দিতে হবে।

মধ্যবর্ত্তী বিদ্যালয় স্তর বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিশেষ কাজ হল ছাত্রদের সাধারণভাবে মানবিক জ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা। এই স্তরে ভাষা, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত ও হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থাও করতে হবে, কারণ এর দ্বারা তাদের বৌদ্ধিক, সৌন্দর্য-মূলক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। এ ছাড়া পাঠক্রমে ছাত্রদের শারীর শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে অবলম্বন করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই স্তরে আমরা কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞানের গভীরতা প্রত্যাশা করছি না, কেবল মানব সংস্কৃতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা দিতে চাচ্ছি। সেইজন্য এই স্তরে পাঠক্রমকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। এই সব বিষয় বিবেচনা করে কমিশন এই স্তরের পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ করেছেন—

১। ভাষা সমূহ
২। সমাজ বিদ্যা
৩। সাধারণ বিজ্ঞান
৪। অঙ্ক
৫। শিল্প ও সঙ্গীত
৬। হাতের কাজ
৭। শারীর শিক্ষা

এই স্তরে নিম্নলিখিত ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে—মাতৃ-ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী (হিন্দী মাতৃভাষা হ'লে অপর একটি ভাষা)। বর্ত্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ছাত্র বা অভিভাবক না চাইলে ইংরাজীকে আবশ্যিক ভাষা করা চলবে না। ইচ্ছা করলে ছাত্র ইংরাজীর পরিবর্ত্তে অন্য ভাষা শিক্ষা করতে পারবে। মাতৃভাষায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করার পর অন্য ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই বছরে একাধিক নতুন ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা চলবে না।

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম :—

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষে সাধারণত ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ আগ্রহ ও প্রবণতাগুলি নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলে ছাত্রেরা তাদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় বেছে নিতে পারবে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়। আর বাকী ছাত্রেরা জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। সেইজন্য মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা যাতে আংশিকভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী একই ধাচের হবে। এতে সকলের জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় বিষয় (Core Subjects) এবং কতকগুলি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন করতে যাতে সুবিধা হয় সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিষয়কে কতকগুলি গ্রুপে ভাগ করে দিয়েছেন। নীচে কমিশন প্রদত্ত পাঠক্রমের নমুনাটি দেওয়া হল—

ক। (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা ও প্রাচীন ভাষার মিশ্র কোর্স

(২) নিম্নলিখিত ভাষাগুলি থেকে যে কোন একটি ভাষা—

(ক) হিন্দী (হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয়)

(খ) প্রারম্ভিক ইংরাজী (যারা মধ্যবর্ত্তী স্তরে পাঠ করেনি তাদের জন্য)

(গ) এ্যাডভানস্‌ড্‌ ইংরাজী (যারা পূর্ববর্ত্তী স্তরে ইংরাজী পড়েছে তাদের জন্য)

(ঘ) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দী ছাড়া)

(ঙ) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা ইংরাজী ছাড়া)

(চ) একটি প্রাচীন ভাষা

খ। (১) সমাজ বিদ্যা (প্রথম দু বছরের জন্য)

(২) অঙ্ক সহ সাধারণ বিজ্ঞান (প্রথম দু বছরের জন্য)

গ। নিম্নলিখিত যে কোন একটি হাতের কাজ

(ক) সুতাকাটা ও বয়নশিল্প

(খ) কাঠের কাজ

(গ) ধাতুর কাজ

(ঘ) বাগানের কাজ

(ঙ) দর্জ্জির কাজ

(চ) টাইপের কাজ

(ছ) ওয়ার্কশপের কাজ

(জ) সেলাই ও এমব্রয়ডারি

(ঝ) মডেল তৈরী

ঘ। নিম্নলিখিত যে কোন একটি গ্রুপ থেকে তিনটি বিষয় :

গ্রুপ ১—মানব বিজ্ঞান (Humanities)

(ক) একটি প্রাচীন ভাষা অথবা একটি তৃতীয় ভাষা

(খ) ইতিহাস

(গ ভূগোল

(ঘ) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

(ঙ) মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র

(চ) অঙ্ক

(ছ) সঙ্গীত

(জ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

গ্রুপ-২ :—বিজ্ঞান

(ক) পদার্থ বিদ্যা

(খ) রসায়ন শাস্ত্র

(গ) জীববিদ্যা

(ঘ) ভূগোল

(ঙ) অঙ্ক

(চ) শারীর বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

গ্রুপ-৩ :—কারিগরি বিদ্যা

(ক) প্রয়োগমূলক অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতিক অঙ্কণ

(খ) প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান

(গ) মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারিং

(ঘ) ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ারিং।

গ্রুপ-৪ :—বাণিজ্য

(ক) কমার্শিয়াল প্রাকটিশ

(খ) বুক-কিপিং

(গ) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

(ঘ) শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

গ্রুপ-৫—কৃষি

(ক) সাধারণ কৃষি

(খ) পশুপালন

(গ) উদ্যানপালন বিদ্যা

(ঘ) কৃষি মূলক রসায়ণ ও উদ্ভিদবিদ্যা।

গ্রুপ-৬—চারু শিল্প

(ক) শিল্পের ইতিহাস

(খ) অঙ্কণ ও নক্সা

(গ) চিত্রাঙ্কণ

(ঘ) মূর্তি নির্মাণ

(ঙ) সঙ্গীত

(চ) নৃত্য।

গ্রুপ-৭—গৃহ বিজ্ঞান

(ক) গার্হস্থ্য অর্থনীতি

(খ) পুষ্টিবিধান ও রন্ধন বিদ্যা
(গ) মাতৃত্ব ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ
(ঘ) গৃহস্থালি ও শুশ্রূষা

৬। উপরোক্ত যে কোন গ্রুপ থেকে ছাত্র একটি অতিরিক্ত বিষয় (additional subject) গ্রহণ করতে পারে।

পাঠ্য পুস্তক (Text books)

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক সমিতি (Text book Committee) নিয়োগ করতে হবে। এই সমিতি একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

২। পাঠ্যপুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা একটি ফাণ্ড গঠন করতে হবে। এই ফাণ্ড থেকে ছাত্রদের স্কলারশিপ, পুস্তক প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৩। পাঠ্য পুস্তক সমিতি পুস্তকের কাগজ, ছাপা, ও অন্যান্য ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিয়মাবলী রচনা করবেন।

৪। কোন বিষয়ের জন্য একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করা হবে না। একটি বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট মানের একাধিক পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলি তাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন একটি পুস্তক বেছে নেবে।

৫। ভাষাশিক্ষার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর মান অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকবে।

৬। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত পুস্তকে এমন কোন বক্তব্য থাকবে না যাতে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসে আঘাত লাগে কিংবা তরুণ ছাত্রদের মন কোন বিশেষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৭। পাঠ্যপুস্তক যাতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাদানের সক্রিয় পদ্ধতি (Dynamic methods of teaching)

শিক্ষার উন্নতির জন্য যত ভাল পাঠক্রমই রচনা করা যাক না কেন শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি এবং সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য

শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির কাজ হল শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উন্নততর পদ্ধতি চালু করা। কমিশন ভ্রান্ত পদ্ধতি দূর করার জন্য কি কি মূল নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সঠিক পদ্ধতির লক্ষ্য :—

সঠিক পদ্ধতির লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পদ্ধতি বলতে কেবল ছাত্রদের কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করার কৌশলকে বোঝায় না। ভাল বা মন্দ যে কোন পদ্ধতি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে। কোন পদ্ধতি কেবল ছাত্রের মনের উপরই যে প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার কাজকর্ম ও বিচার পদ্ধতি, তার বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভমূলক জীবন্ এবং তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে সব পদ্ধতি মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত তা ছাত্রের জীবনকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলতে পারে, অপরপক্ষে মন্দ পদ্ধতি জীবনের অবনতি ঘটায়। সেইজন্য পদ্ধতি নির্বাচনের সময় শিক্ষককে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। উত্তম পদ্ধতির নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি থাকা উচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি যেন নিহিত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সকল পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল ছাত্রদের মধ্যে কর্মের প্রতি আসক্তি গড়ে তোলা, যাতে তারা তাদের সাধ্যানুসারে সর্বাধিক যোগ্যতার সঙ্গে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যম দুইটি—উন্নত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ এবং কোন কাজ সম্পাদনের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। শিক্ষা যদি ছাত্রের মধ্যে কাজের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তারা মনপ্রাণ দিয়ে কোন কাজ করতে শিখবে না এবং তাদের চরিত্রও গঠিত হবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রের যোগ্যতার মানের উন্নতি সাধন এবং উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা ছাড়া আর অন্যকিছু করতে পারে না। প্রতিটি বিদ্যালয় এবং তার প্রতিটি ছাত্রের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে "যে কাজ ভাল তা ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে"; তা সে বক্তৃতা দেওয়াই হোক, কোন রচনা লেখাই হোক, আর শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করাই হোক—যাই হোক না কেন। সেইজন্য অল্প সংখ্যক কাজ হাতে নিয়ে তা যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; অনেক কাজ হাতে নিয়ে তা বিশৃঙ্খলভাবে শেষ করার

কোন অর্থই হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উত্তম অভ্যাস ও দক্ষতা তত্ত্বগতভাবে অর্জন করা যায় না। সুঅভ্যাস দীর্ঘদিনের চর্চ্চার দ্বারা গড়ে তুলতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রের মধ্যে সৃষ্টি করা যায় না—যে কাজ সম্পন্ন করতে শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেইরূপ কাজে ক্রমাগত অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বর্ত্তমানে মৌখিক শিক্ষার আধিপত্য শিক্ষাদান পদ্ধতিকে দূষিত করে তুলেছে। একথা মনে করা হয়ে থাকে যে ছাত্র যদি কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করতে পারে তাহলে তার অন্তর্নিহিত ভাবটিও সে আয়ত্ত করতে পারবে। এই ধারণার ফলে ছাত্রকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে হয়। কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে হয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা; উদ্দেশ্যমূলক বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই জ্ঞান অর্জন করা যায়। বর্ত্তমানে ছাত্র কিছু পরিমাণ তথ্যসম্ভারকে সম্বল করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে—প্রকৃত জ্ঞান সে অর্জন করতে পারে না। সেইজন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার যার দ্বারা শিক্ষা বাস্তবানুগ হয়ে উঠবে, জীবনের সঙ্গে তার ব্যবধান দূর হবে এবং বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক, মাধ্যমিক স্তরের পর আর শিক্ষা গ্রহণ করবে না। কাজেই এই স্তরে যদি তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ না ঘটানো যায় তাহলে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার সময় ছাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর উপর জোর দিতে হবে এবং ছাত্রেরা যাতে সহজ সরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সহজ প্রকাশভঙ্গী হল পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে কমিশন অত্যধিক বাড়ীর কাজ (home work) দেওয়ার প্রথার নিন্দা করেছেন। কারণ এটা ছাত্রের পক্ষে বোঝা স্বরূপ এবং এতে ছাত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং তার কাজ করার প্রকৃত অভ্যাস গড়ে ওঠে না। কমিশনের মতে কেবল উঁচু ক্লাসেই বাড়ীর কাজ দেওয়া উচিত এবং তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংশোধন করে দেওয়া উচিত যাতে তাদের

দোষত্রুটিগুলি ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়। অনেক বাড়ীর কাজ দিয়ে তা সংশোধন না করার চেয়ে অল্প কাজ দিয়ে তা ভালভাবে দেখে দেওয়া অনেক ভাল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা কিছু করবে না কোন বিষয়ে যদি ছাত্রের প্রকৃত আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তাহলে সে ঐ বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়তে উৎসাহী হবে, চার্ট, মডেল প্রভৃতি তৈরী করতে উৎসাহী হবে। এক্ষেত্রে এই কাজগুলি হবে স্বতঃস্ফূর্ত, বাইরে থেকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন কাজ নয়।

পরিশেষে শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি যাতে ছাত্রের বিভিন্ন প্রকার আগ্রহের পরিপুষ্টি সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধিমান এবং সজাগ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ছাত্রদের মধ্যে নানারকম নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন, এবং যে আগ্রহ ছাত্রের মধ্যে বর্তমান আছে তার পরিপুষ্টি সাধন করতে পারেন। কমিশন সম্ভব হলে সময় পত্রিকায় এমন একটি ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করতে বলেছেন যখন ছাত্রেরা একজন উৎসাহী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কোন না কোন সৃজনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকবে।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির মূল্য (Value of Activity Methods) :—

বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি হল গতানুগতিক। এখনও মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাদানের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই এবং কথায় ও লেখায় আত্মপ্রকাশের মানের অবনতি রোধ করার কোন প্রচেষ্টাই হচ্ছে না। পদ্ধতির সংস্কার করতে হলে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিটি ছাত্রকে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সেইজন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি এইরূপ হবে যাতে বিষয়-বস্তুকে কতকগুলি ইউনিট অথবা প্রোজেক্টে ভাগ করা যায় এবং যার মধ্য দিয়ে ছাত্র কর্মে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে গতানুগতিক পাঠদানের প্রথা অনেকাংশে দূর হবে। ছাত্র যখন তার জীবনের সঙ্গে তার পাঠের সম্পর্ক খুঁজে পায় তখন সে আন্তরিকভাবে পাঠে মনোযোগ দেয়, কারণ এর ফলে তার মধ্যে স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সে নতুন প্রেরণা লাভ করে থাকে। সেইজন্য শিক্ষকের কাজ হল জীবন ও জ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং

এমনভাবে কাজের পরিকল্পনা করা যাতে ছাত্রেরা কথাবার্ত্তায়, লেখায়, পড়ায়, গবেষণায়, সৃজনমূলক কাজকর্মে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তাদের হাত ও মনের মধ্যে সফল সহযোগিতা স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়-গুলিতে এই ধরনের কার্যসূচীর পরিবর্ত্তে মৌখিক শিক্ষাদানের প্রাধান্য দেখা যায়—শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা নোট লেখাচ্ছেন—আর ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয়-ভাবে তা শুনছে কিংবা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বাড়ীতে সেগুলি মুখস্থ করছে। জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ বা সদিচ্ছা কিছুই নেই—সব চেয়ে বড় কথা হল পরীক্ষায় পাশ করা। যদি কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যদি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং স্বাধীনভাবে তা কার্যে রূপায়িত করা হয় তাহলে বর্ত্তমানের গ্রন্থকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং সেগুলি হবে ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদানের যথার্থ কেন্দ্র। এই জাতীয় পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ও সৃজনমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে। প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি উত্তম হাতের কাজের পিছনে যেরূপ উদ্যম থাকে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। এর অর্থ হল প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের সময় ছাত্র যাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে। ভূগোলে মানচিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরী, ভ্রমণের আয়োজন প্রভৃতি কাজের মধ্যে ছাত্র এই সুযোগ পেতে পারে। ইতিহাসে ছাত্রেরা ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করতে পারে কিংবা যৌথভাবে স্থানীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারে কিংবা ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছোট একটি যাদুঘর স্থাপন করতে পারে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা তাদের পছন্দমত বিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করতে পারে। বড় বড় লেখকদের ছবি, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ছাত্রেরা চার্ট তৈরী করতে পারে কিংবা সহজ ইংরাজী রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করতে পারে। বিদ্যালয় পত্রিকা এইরূপ আর একটি প্রোজেক্ট যার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা যে সৃজনমূলক রচনার সুযোগ পায় তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে তারা নানাবিধ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। তবে বাধ্যতামূলকভাবে এই কাজ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না, তারা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা স্মরণ

রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রকে কি পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হল সেটা বড় কথা নয়, কত ভালভাবে ছাত্র তা আয়ত্ত করতে পারছে সেটাই বড় কথা। প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার এত বেড়েছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের এক শতাংশও আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। কাজেই ছাত্রদের অধিক জ্ঞানদান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষককে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে—ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের সুনিপুন কৌশল শেখানো। যদি ছাত্রের মধ্যে যথাযোগ্যভাবে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তাহলে পরবর্ত্তীকালে যখনই সে প্রয়োজন অনুভব করবে তখনই প্রয়োজনীয় জ্ঞান সে অর্জন করতে পারবে, অপরপক্ষে ছাত্রের মধ্যে যে স্থবির জ্ঞান জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা তার মনকে উদ্দীপিত করে না বরং পরীক্ষাগৃহে ভারমুক্ত হবার পরই সে তা ভুলে যায়।

সেইজন্য জ্ঞানের পরিমাণ অপেক্ষা বর্ত্তমানে জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে পঠন কৌশল শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্র কতকগুলি শব্দের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে এবং মুখে সেগুলি উচ্চারণ করলেই ধরে নেওয়া হয় সে বিষয়টি পড়েছে। কিন্তু একে প্রকৃত পড়া বলা চলে না। কারণ পড়ার মধ্যে কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া বর্তমান—যেমন শব্দগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় করা, কতকগুলি ধারনা গঠন করা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা। পঠনের এই কৌশল আপনা থেকে আয়ত্ত করা যায় না, সচেতন অভ্যাসের দ্বারা এই কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এইরূপে পাঠক্রমের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় কিভাবে পাঠ করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্রদের উপযোগী পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে এমন কতকগুলি কাজ থাকে সেগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ভালভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের বিষয়টি চলে আসে। শিক্ষক যদি ছাত্রের মনস্তাত্বিক চাহিদা অনুযায়ী তাঁর পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারেন তাহলে তিনি ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করতে পারবেন না। বর্তমানে বুদ্ধিহীন, সাধারণ

বুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান সকল প্রকার ছাত্রের'জন্য একই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা কার্যকরী হচ্ছে না। যদি এই বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের আপন আপন স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে দেওয়া হয় এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি ও পাঠক্রম স্থির করা হয় তাহলে তাদের সকলেরই যথেষ্ট উপকার হবে—কারণ তাতে বুদ্ধিহীন ছাত্রেরা নিরুৎসাহবোধ করবে না আর বুদ্ধিমান ছাত্রেরা হতাশার হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমেরিকায় এই তিন প্রকার ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমে ক, খ, ও গ এই তিনটি প্রবাহ (three streams) রয়েছে। গ প্রবাহের ছাত্রের জন্য বিষয়বস্তুর পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। এই তিন প্রকার ছাত্রদের শিক্ষণ পদ্ধতিতেও কিছুটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। কারণ বুদ্ধিমান ছাত্রদের বিভিন্ন কাজকর্মে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া যাবে, বুদ্ধিহীন কিংবা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের সেই পরিমাণ স্বাধীনতা দিলে সবসময় সুফল পাওয়া যাবে না—তা ছাড়া শেষোক্ত দুই প্রকার ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঠিক পরিচালনার প্রয়োজনও অনেক বেশী।

ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন :—

বিচক্ষণ শিক্ষক ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করবেন। বাস্তব জীবনে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও প্রয়োজন আছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা যথাযথ-ভাবে দেওয়া হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এইজাতীয় মনোভাবের প্রয়োজন থাকলেও এর দ্বারা ছাত্র সাফল্যের সঙ্গে সমাজজীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। যৌথ কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজজীবনে অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে। সেইজন্য কমিশন শিক্ষকদের এমনভাবে শিক্ষিত করার কথা বলেছেন যাতে তাঁরা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু বিষয়কে বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এইভাবে ছাত্রেরা যৌথ কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা লাভ করবে। এইসব প্রোজেক্টের মধ্যে দিয়ে পুঁথিগত শিক্ষার একঘেয়েমী

দূর হবে এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। রসায়নশাস্ত্রে জলের পরিশুদ্ধি (Purification of water) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ সম্পর্কে ছাত্রকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। পৌরবিজ্ঞানের পাঠদান প্রসঙ্গে লোকাল বোর্ডের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে কিংবা স্থানীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বস্তুত প্রতেক সমাজের জীবনযাত্রাতেই এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে যেগুলিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার "জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার" (learning by living) আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে যার উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা ; এইভাবে বিদ্যালয় ও সমাজ পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

বিদ্যালয়ে পাঠাগারের স্থান

এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি হল নিম্নরূপ :

১। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে এবং ছাত্রদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ে শ্রেণী পাঠাগার (class library) এবং বিষয় পাঠাগারেরও (Subject library) গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রাখতে হবে এবং প্রতিটি শিক্ষককে পাঠাগারের কাজের মূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৩। যেখানে পৃথক পাবলিক লাইব্রেরী নেই সেখানে জনসাধারণ যাতে বিদ্যালয় পাঠাগারের সুযোগ লাভ করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশু ও প্রাপ্ত যৌবনদের জন্য পৃথক বিভাগ রাখতে হবে।

যাদুঘর ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ

যাদুঘর (Museum)

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে যাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ছাত্রদের যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে নীরস বক্তৃতা শোনার চেয়ে যাদুঘরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিস দেখার মধ্য দিয়ে ছাত্র অনেক বেশী লাভবান হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন শহরে যে ধরণের যাদুঘর আছে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন স্থানে সেইরূপ যাদুঘর স্থাপন করা উচিত যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে এবং বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করে দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। এই সমস্ত যাদুঘরে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় জনসাধারণও এইসব যাদুঘর থেকে প্রভূত শিক্ষা লাভ করতে পারে।

দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন—চলচ্চিত্র ও রেডিও
(Audio-Visual Aids—Films and Radio)

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন রাজ্যে জনশিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয় এই জাতীয় প্রদীপন ও ফিল্ম পেয়ে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা-দানের সময় এগুলি ব্যবহার করে থাকে। এইভাবে ছাত্রেরা কেবল তত্ত্বগত শিক্ষাই লাভ করে না, সেইসঙ্গে এইজাতীয় প্রদীপনের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলিকে তৎপর হতে বলেছেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন। বলাবাহুল্য যে সুযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা এই আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের আগ্রহ যাতে আরও বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এইজাতীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা একঘেয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করলে তার দ্বারা ছাত্রদের অপকারই হবে। সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের দ্বারা বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এই জাতীয় আলোচনার দ্বারা ছাত্রেরা যথার্থ উপকৃত হবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা

শিক্ষার যত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাই করা হোক না কেন বিদ্যালয়ে

শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে। বিভিন্ন প্রকার তথ্যের ভিত্তিতে কমিশনের এই ধারনা হয়েছে যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যেই শৃঙ্খলাবোধ জাগানো দরকার। যদি প্রকৃত শিক্ষা দিতে হয় তাহলে বিদ্যালয় থেকে শৃঙ্খলাহীনতা দূর করতে হবে।

শৃঙ্খলার উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব :—

শৃঙ্খলাহীনতা দলগত ও ব্যক্তিগত দুই প্রকারেরই হতে পারে। এদের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলাহীনতা অধিক ক্ষতিকর। বর্ত্তমানে দলগত শৃঙ্খলাহীনতা অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। অন্যত্র শৃঙ্খলাহীনতার ঘটনা ঘটলে ছাত্রেরা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। নানা কারণে বিদেশী শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটছে। তখন এই জাতীয় ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও স্বাধীনতা লাভের পর আর এইজাতীয় ঘটনা সমর্থন করা যায় না। এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এখনও যদি শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে তা গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে ফেলবে।

শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করার উপায় :—

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ছাত্রদের যথাযথভাবে নাগরিকের কর্ত্তব্য পালন করতে শেখানো। সেইজন্য পিতামাতা, শিক্ষক, জনসাধারণ ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলকেই শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির কতকগুলি প্রত্যক্ষ উপায় রয়েছে। ভারতীয় ছাত্রদের শৃঙ্খলার প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বাহ্যিক শক্তির চাপে পড়েই তারা বিপথে চালিত হয়। তারা নিয়মকানুন পছন্দ করে এবং সাধারণত সেগুলি মেনে চলে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এইজাতীয় মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করা উচিত। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন এবং এইজন্যই কমিশন বিদ্যালয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করার পক্ষপাতী। সাধারণ শৃঙ্খলা ও ছাত্রদের অবস্থার উন্নতির প্রতি শ্রেণীশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব ছাত্রদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। বাইরে থেকে শাসনের দ্বারা ছাত্রের উপর শৃঙ্খলাবোধ চাপিয়ে দেওয়া যায় না, ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টাতেই আত্মশৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে পারে। সকলে নির্দ্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলছে কিনা তা

দেখার জন্য ছাত্রেরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই প্রতিনিধিদের কাজ হবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও সুনাম বজায় রাখা। কমিশন বিদ্যালয়ে সংসদ প্রথা চালু করার পক্ষপাতী—এই ছাত্র সংসদের দায়িত্ব হবে একটি আচরণবিধি রচনা করা এবং বিদ্যালয়ে সেটি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।

দলগত খেলাধূলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের খুব ভালভাবে শৃঙ্খলাবোধের মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায়। খেলার মাঠেই ছাত্রদের মধ্যে দলগত মনোভাবের (team spirit) যথার্থ উন্মেষ ঘটে। বয় স্কাউট, গার্ল গাইড, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর প্রভৃতি পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত শৃঙ্খলাবোধ জন্মে। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে যৌথ সমাজ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ উপায় ছাড়াও পরোক্ষভাবেও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা যায়। কোন দেশের ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খলাবোধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শৃঙ্খলাবোধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। দেশের কোন কোন অংশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কার্যাবলী অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির সহায়ক হয় না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাহীনতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সবসময় দায়ী করা যায় না। কমিশন একথা জানতে পেরেছেন যে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা ছাত্রদের নির্বাচনের কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করেন না। এইভাবে নির্বাচনের প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তরুন ছাত্রদের মনে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এইজাতীয় প্রবণতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। একে রোধ করতে হলে যে সব ছাত্রের বয়স ১৭ বছরের কম তাঁরা যাতে মতবিরোধমূলক রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে এবং নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের মতে এইসব ছাত্রকে রাজনৈতিক প্রচারকার্যে লাগানো নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিত।

এই প্রশ্নের আর একটি দিক আছে সেটি এখানে উল্লেখ করা দরকার। অনেক সময় কোন কোন রাজনীতিবিদ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করে থাকেন। এইজাতীয় বক্তৃতার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে এবং আমরা একরকম প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিই। কিন্তু যেক্ষেত্রে ছাত্রেরা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হল রাজনৈতিক প্রচার, সেক্ষেত্রে এইজাতীয় বক্তৃতা ছাত্রদের শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতার সহায়ক হয় না।

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ—

পরিশেষে শিক্ষকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকলে তবেই ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হতে পারে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং শিক্ষকদের সাংগঠনিক কাজকর্মে শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে যে ছাত্রেরা সর্বদা তাঁর কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছে। সেইজন্য ব্যক্তিগত আচরণে এবং দেশের কোন সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে তার পেশাগত স্বার্থের একটা সীমারেখা মেনে চলতে হবে। আমাদের সংবিধানে শিক্ষকগণকে আইন সভায় অংশ গ্রহণ করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে কমিশন স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু যে-কোন দলভুক্তই হোন না কেন শিক্ষকের উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চলা উচিত। অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্যেরা শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। এইজাতীয় প্রচেষ্টাকেও অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকগণের উপর ছাত্রদের আচরণ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ঃ—

স্বেচ্ছায় যারা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্যকাল ছাড়া অন্য সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পিতামাতা ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের ঐ ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী ঃ—

এই জাতীয় কার্যাবলী বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হবে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে এই কাজের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে।

স্কাউট আন্দোলনের জন্য রাষ্ট্রকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে এবং স্কাউট ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে প্রত্যেক বছর ঐ ক্যাম্পে কিছুদিন কাটাবার সুযোগ পায় বিদ্যালয়কে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এন. সি. সিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনতে হবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি ও প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে ফার্স্ট এইড, সেণ্ট জন্‌স্ এ্যাম্বুলেন্স ও জুনিয়ার রেড ক্রস-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণে ছাত্রদের উৎসাহ দিতে হবে। এছাড়া আরও

অনেক পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী রয়েছে যেগুলি বিদ্যালয়ে চালু করার ব্যবস্থা করা উচিত, যেমন, পদচারণা, দাঁড়টানা, সন্তরণ, প্রমোদ ভ্রমণ, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়, চিত্রাঙ্কন, বাগানের কাজ ইত্যাদি। এই কার্যাবলীর দ্বারা ছাত্রদের সৃজনমূলক প্রতিভা ও সামাজিক প্রবণতার বিকাশ ঘটতে পারে। এইসব কার্যাবলীর সাফল্য শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যদিও ছাত্রেরা নিজেরাই এই সমস্ত কাজকর্ম করবে তথাপি শিক্ষকদের সর্বদাই ছাত্রদের পাশে পাশে থাকতে হবে যাতে ঐসব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি ছাত্রই যাতে কোন না কোন কাজে অংশগ্রহণ করে শিক্ষকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা দপ্তরকে এইসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে।

চরিত্র গঠনের শিক্ষা : শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম যেমন গৃহ ; পাঠক্রম, পদ্ধতি, নিয়মানুবর্তিতা ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী সহ বিদ্যালয় এবং স্থানীয় সমাজ—এদের প্রভাবে ছাত্রের চরিত্র গঠিত হয়। পাঠ্যপুস্তক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা ছাত্রের মধ্যে সঠিক আদর্শ ও মূল্যবোধ জন্মে। কিন্তু এদের মধ্যে ছাত্রের উপর সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে বিদ্যালয়ের সমাজজীবন, তার সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান ও কর্তব্য-সমূহ, তার স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মানুবর্তিতা, তার নেতৃত্বগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং সমাজ সেবার কার্যসূচী। বিদ্যালয় যত সুষ্ঠুভাবে ছাত্রকে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা করতে পারবে ছাত্রের চরিত্রও সেই অনুযায়ী সুন্দরভাবে গঠিত হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা
(Guidance and Counselling in Secondary Schools)

এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষামূলক নির্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

২। কলকারখানার বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম সম্পর্কে ছাত্রেরা যাতে জ্ঞানলাভ করতে পারে তারজন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রেরা যাতে ঐসব কলকারখানা দেখার সুযোগ পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইডেন্স অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টার নিয়োগ করতে হবে।

৪। কেন্দ্রকে গাইডেন্স অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের ব্যবস্থা
(The Physical Welfare of Students)

শারীর শিক্ষা (Physical Education) ও স্বাস্থ্যশিক্ষার (Health Education) গুরুত্ব ঃ—

দেশের তরুণদের শারীরিক কল্যাণের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ছাত্রাবস্থায় ছেলেমেয়েরা যদি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হতে পারে তাহলে পরবর্তী জীবনে নানারকম ব্যাধির দ্বারা তারা সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিদের নিয়ে কোন জাতিই শক্তিশালী হতে পারে না। সেইজন্য কোন রাষ্ট্রই স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

একথা বলা হয়ে থাকে যে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হচ্ছেনা। স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে তরুণেরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তখন তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এইরূপ চলতে থাকলে দেশের চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের পরিমান বেড়ে যাবে। তা ছাড়া স্বাস্থ্যহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া। ব্যক্তির উপার্জন করার ক্ষমতা কমে গেলে সে তার পরিবারের কিংবা দেশের কোনই উপকার করতে পারবে না। কাজেই স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education) ঃ—

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে যতদিন পর্যন্ত স্বাস্থ্যশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত না হচ্ছে ততদিন দেশের যুবক সম্প্রদায় দেশের কল্যাণে তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারবে না। এতদিন পর্যন্ত পুঁথিগত শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে ; ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উপযুক্ত মান রক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি।

যেসব পন্থা অবলম্বন করতে হবে

স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। প্রতিটি ছাত্র যাতে বিদ্যালয়ে এবং বাড়ীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কতকগুলি হিতকর অভ্যাস গঠন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে, এ ব্যাপারে ছাত্রদের যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এবং তা বজায় রাখতে পারে। কেবল শারীরিক কারণেই যে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য উত্তম দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই সকল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল ছাত্রদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাতে তারা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সর্বাধিক সুফল লাভ করতে পারে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Medical Examination)

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা এবং তাদের দৈহিক বিকাশ ঠিকমত ঘটছে কিনা তা দেখবার জন্য প্রতিটি ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। যদিও কতকগুলি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবু নিম্নলিখিত কারণে তার ফলাফল সন্তোষজনক নয়—

(১) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়না।

(২) স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেসব ত্রুটি ধরা পড়ে তা দূর করার কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরবর্তী কার্যসূচী পালন করা হয়না।

(৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতা স্থাপিত হয়নি এবং অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

সেইজন্য কমিশন মনে করেন যে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পারলে এইভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। স্বাস্থ্যপরীক্ষার উন্নতিকল্পে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন—

(১) স্বাস্থ্যপরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হওয়া উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বছরে অন্তত একবার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা

এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করার পূর্বে আর একবার অনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) যে সব ছাত্রের শরীরে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে বা যারা কঠিন পীড়ায় ভুগছে তাদের স্বাস্থ্য আরও ঘন ঘন পরীক্ষা করা উচিত।

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাহায্যে যখন নিরাময়মূলক পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তখন দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(৪) স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের এক কপি মেডিক্যাল অফিসারের কাছে থাকবে, এক কপি অভিভাবকের কাছে পাঠানো হবে এবং তৃতীয় কপিটি শ্রেণীশিক্ষকের কাছে থাকবে। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে রিপোর্ট থাকবে তারই ভিত্তিতে ছাত্রকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয়ের চিকিৎসক এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এইরূপে ছাত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে বিদ্যালয় তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ ও জনসমাজ
(School Health Service and the Community)

ইতিপূর্বে জনসমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করার উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেক রকম কাজের দ্বারা বিদ্যালয় সমাজের উপকার করতে পারে এবং সমাজও অনেক কাজে বিদ্যালয়কে সহযোগিতা করতে পারে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়কে যে সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে তার ক্ষেত্র শিশুদের গৃহ, তাদের প্রতিবেশ এবং সমগ্র গ্রাম অথবা নগরব্যাপী প্রসারিত হবে। এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য কেবল যেটুকু সময় তারা বিদ্যালয়ে কাটায় তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং যে সময় তারা গৃহে এবং তার আশেপাশে কাটায় তার দ্বারাই তাঁদের স্বাস্থ্য অধিকপরিমাণে নির্ধারিত হয়। বিদ্যালয় যদি ছাত্রের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গৃহ ও জনসমাজের ভূমিকাকে অস্বীকার করে তাহলে ছাত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের অনেক প্রচেষ্টা বিদ্যালয় বহির্ভূত শক্তির প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। একথার অর্থ এই নয় যে বিদ্যালয় বাইরের পরিবেশকে সরাসরি নিয়ন্ত্রন করবে ; কিন্তু ছাত্র ও অভিভাবকদের শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে, গ্রামের চিকিৎসকও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং জনসাধারণকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে

বিদ্যালয় বাইরের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। বিদ্যালয় যদি একটি ছোটখাট অঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে তাহলে তার দ্বারা ছাত্র, অভিভাবক ও ঐ অঞ্চলের জনসমষ্টি প্রকৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা লাভ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের এই কাজে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করা উচিত। এইরূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা শ্রমের মর্যাদাবোধ সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করতে পারবে।

শিক্ষকদের ভূমিকা :—

বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকেন বলে তাদের পক্ষে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, ত্রুটিপূর্ণ দেহের ভঙ্গী, কানে কম শোনা প্রভৃতি ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা সহজ। সেইজন্য শিক্ষকদের প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষকেরা যদি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন তাহলে ছাত্রদের মধ্যে কোনরূপ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেওয়া মাত্র তারা বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সে কথা জানাতে পারবেন।

শারীর শিক্ষা (Physical Education) :—

কমিশন প্রথমে স্বাস্থ্য শিক্ষার কথা আলোচনা করেছেন কারণ শারীর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর। শারীর শিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন কার্যাবলী এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অবসর বিনোদনের জন্য তারা নানাবিধ দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তি, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। সুতরাং শারীর শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র ড্রিল অথবা বিভিন্নপ্রকার ব্যায়ামকে বুঝায় না। যে সব শারীরিক ক্রিয়াকর্ম ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেগুলি শারীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

ছাত্রদের যথাযথভাবে শারীর শিক্ষা দিতে হলে এই বিষয়ের শিক্ষককে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে এই শিক্ষা দিতে হবে। শারীর শিক্ষার অন্তর্গত সমস্ত কার্যাবলীও দলগত হলেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত শারীরিক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে ঐ

সব কাজ পরিচালনা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা অধিকর্তার (Director of Physical Education) তত্ত্বাবধানে শারীর শিক্ষা, দলগত খেলাধূলা ও ব্যক্তিগত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মত শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়কে সমাজের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রেরা সাঁতার, নৌকাচালনা ও অন্যান্য আঞ্চলিক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ের বাইরে যেখানে বিশেষ ধরণের খেলাধূলা বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে ছাত্রদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয় একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিতে পারে যখন ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রেরা খেলাধূলার সুযোগ পাবে।

শিক্ষক ও শারীর শিক্ষা ঃ—

যদিও শারীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধানত ঐ কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের, তবু বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া এই শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষকের বয়স ৪০ বছরের কম তাদের প্রত্যেকেরই সক্রিয়ভাবে শারীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে এই বিষয়টি কোন একজন শিক্ষকের একার বিষয় না হয়ে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যসূচীর একটি প্রাণবন্ত অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

কমিশন দলগত খেলাধূলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ এর দ্বারা ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি হয়, তারা ভালভাবে অবসর বিনোদন করতে পারে এবং তাদের চরিত্রও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কমিশন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা প্রচলিত আছে তার দ্বারা দলগত খেলধূলায় ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু এর একটি কুফল হল এই যে এইসব প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার জন্য যারা খেলাধূলায় ভাল তারাই কেবল বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ব্যবহার করার সুযোগ পায় আর অন্যান্য ছাত্রেরা নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের খেলাধূলায় এই জাতীয় পেশাদারী প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

(A new approach to examination and evaluation)

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা (examination) এবং মূল্যায়ন (evaluation) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ছাত্রেরা লেখাপড়ায় কিরূপ অগ্রগতি লাভ করছে এবং কোন বিশেষ একটি স্তরে তারা কিরূপ যোগ্যতা অর্জন করেছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে মাঝে তা জানা প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজ বিদ্যালয়ের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযোগ্যভাবে পালিত হচ্ছে কিনা ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করছে কিনা সমাজেরও সে সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

পরীক্ষা—আভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ (Internal and external) :—

পরীক্ষা আভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ এই দুই রকমের হতে পারে। বিদ্যালয়গুলি আভ্যন্তরীন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বছরে অন্ততঃ একবার এই ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপ করা হয়, তাদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এবং সময়মত তাদের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর উপর শ্রেণী বিন্যাস ও উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়নই কেবল নির্ভর করে না, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও এর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বাৎসরিক পরীক্ষা বিদ্যালয়গুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন কোন বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ান্তিক পরীক্ষাও (terminal examination) গ্রহণ করে থাকে। মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের কাছে বাৎসরিক পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। কারণ এই পরীক্ষার ফলাফলের উপরই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়নের বিষয়টি নির্দ্ধারিত হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষাগুলির উপর বাৎসরিক পরীক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কয়েকটি বিদ্যালয় বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর সংঘটিত পরীক্ষা (Periodic test) ও অন্যান্য পরীক্ষার সর্বাত্মক ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণকাল সমাপ্ত হলে বহিঃস্থ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি, নির্বাচন ও যোগ্যতা নিরূপন। যারা সাফল্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করেছে এই পরীক্ষা তাদের নির্বাচন করে এবং পরবর্ত্তী উচ্চতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। একসময় ম্যাট্রিকুলেশন কিংবা তার সমতুল্য পরীক্ষা ছাড়াও দেশের কোন কোন অংশে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষে যে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হত তাদেরও বহিঃস্থ পরীক্ষা (external or public examination) আখ্যা দেওয়া হত। কোন কোন রাজ্যে এখনও এই জাতীয় পরীক্ষা প্রচলিত আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের এইরূপ প্রত্যয় জন্মেছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অতিমাত্রায় পরীক্ষা দ্বারা শাসিত।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

(Scope and Limitations of the Present System of Examinations in India)

আমাদের দেশে আভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ উভয় প্রকার পরীক্ষাই একই ছাঁচে গঠিত। এই উভয় পরীক্ষারই উদ্দেশ্য হল ছাত্রের পুঁথিগত বিদ্যা এবং তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করা। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রের ক্রম-বিকাশের অন্যান্য দিকগুলির কোনরূপ মূল্যায়ন করা হয় না, কিংবা করা হলেও তা কেবল পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার অর্থ ও কর্মপরিধির যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে। আজকের বিদ্যালয়কে কেবল ছাত্রের বৌদ্ধিক যোগ্যতার পরিমাপ করলেই চলবে না, সেইসঙ্গে শিশুর প্রক্ষোভমূলক ও সামাজিক বিকাশ, তার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, সামাজিক সঙ্গতিবিধান (Social adjustment) এবং তার জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিরও পরিমাপ করতে হবে। এক কথায় বিদ্যালয়কে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করতে হবে।

এমনকি বর্ত্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রের যে বৌদ্ধিক-যোগ্যতার পরিমাপ করে তার সার্থকতা (validity) এবং উপযোগিতা (usefulness) সম্পর্কেও নানারকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে বর্ত্তমানে রচনা-ধর্মী প্রশ্নের (essay-type question) মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে তাতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি (subjectivity) প্রকাশের এত বেশী সুযোগ রয়েছে যে তার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা যায় না। এই

প্রসঙ্গে হার্টগ কমিটির রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে এইজাতীয় পরীক্ষার অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বর্ত্তমানে যেভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাতে ছাত্রদের বৌদ্ধিক যোগ্যতারও যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

আমাদের শিক্ষার উপর পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র ছাত্রদের বৌদ্ধিক যোগ্যতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে এবং এরজন্য প্রধানত আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। পরীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র যে শিক্ষার বিষয়বস্তুই নির্দ্ধারিত হয় তা নয়, শিক্ষনপদ্ধতিও এর দ্বারা নিরূপিত হয় —এক কথায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই পরীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশে পরীক্ষার প্রভাব এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে ছাত্র ও শিক্ষকদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হচ্ছে। কেমনভাবে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এটাই হল ছাত্রের সবচেয়ে বড় চিন্তা। কোন বিষয়ে যদি পরীক্ষা গ্রহণ করা না হয় তাহলে ছাত্র তাতে আগ্রহবোধ করে না। বিদ্যালয়ের কোন কাজ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরীক্ষার সংগে জড়িত না থাকে তাহলে সেই কাজ ছাত্রের মনে কোনরূপ উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে না। যে পদ্ধতির সাহায্যে সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায় ছাত্রেরা তাকেই পছন্দ করে, অপরপক্ষে কোন পদ্ধতির শিক্ষাগত মূল্য থাকলেও পরীক্ষার সংগে যার বিশেষ সম্পর্ক নাই তার প্রতি ছাত্রেরা আকর্ষণ বোধ করে না। পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা সাহায্যকারী পুস্তক বা নোটের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশী। কোন বিষয় ভালভাবে আয়ত্ত করা অপেক্ষা না বুঝে মুখস্থ করার দিকে তাদের ঝোঁক বেশী, কারণ এর দ্বারা তাদের পরীক্ষা পাশের সুবিধা হয় আর পরীক্ষা পাশের উপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে।

পরীক্ষার এই উন্মাদনার দ্বারা শিক্ষকেরাও মোহগ্রস্ত। বর্ত্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয়। উন্নত ধরনের শিক্ষার যেসব লক্ষ্য অর্থাৎ চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান এবং জীবনের উন্নত মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণাপ্রদান প্রভৃতি পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়, অপরপক্ষে পড়াশুনার অগ্রগতি ও বৌদ্ধিক যোগ্যতার পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পরীক্ষার সাহায্যে অতি

সহজেই ছাত্রদের যোগ্যতা বিচার করা যায়। আবার সাধারণত পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা শিক্ষকেরও যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রায়ই শোনা যায় অমুক খুব ভাল শিক্ষক কারণ ফাইনাল পরীক্ষায় তার ছাত্রদের পাশের হার খুব বেশী। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষক তাঁর রিপোর্টে যখন পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রদের কৃতিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তখন মনে হয় কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডারদের কাছে লাভ ক্ষতির হিসাব পেশ করা হচ্ছে। পরীক্ষায় ছাত্রদের পাশের হার দিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করার অর্থ পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাহায্য দানের (Payment by results) পুরাতন ও পরিত্যক্ত প্রথাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিভাবকেরাও এইজাতীয় ঘটনাকে সমর্থন করে চলেছেন। যেহেতু পরীক্ষা পাশের সঙ্গে চাকরী লাভের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য অধিকাংশ অভিভাবক ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ সম্পর্কেই বিশেষ আগ্রহী। এমন কি উচ্চশিক্ষা কিংবা চাকরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ কলেজে কেবলমাত্র সাধারণী পরীক্ষায় (public examination) প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হয়ে থাকে।

এইরূপে বর্ত্তমানে সমস্ত দিক থেকে সমস্ত রকম পরীক্ষার, বিশেষভাবে বহিঃস্থ পরীক্ষার উপর অহেতুক এবং অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার এক সংকোচনমূলক প্রভাব পড়েছে এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে চলেছে।

পরীক্ষাসমূহের স্থান :—

নানাপ্রকার দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার জগতে পরীক্ষাসমূহের, বিশেষভাবে বহিঃস্থ পরীক্ষাসমূহের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বহিঃস্থ পরীক্ষা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই কর্মপ্রেরণা দেয় এবং উভয়ের সম্মুখে একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য উপস্থাপিত করে। ছাত্রকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয় এবং তারজন্য তাকে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। পরিশেষে সে যখন পরীক্ষায় পাশ করে তখন সে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। শিক্ষকও বহিঃস্থ পরীক্ষার দ্বারা

কর্মপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। এই পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত মান সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তিনি কোন ছাত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন। তাছাড়া এইজাতীয় পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা বিভিন্ন বিদ্যালয় তাদের কাজের তুলনামূলক বিচার করতে পারে।

বর্ত্তমান পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি সুপারিশ :—

উপরোক্ত বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বহিঃস্থ পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এই পরীক্ষার অবাঞ্ছিত ফলাফলগুলি কমানোর জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, অধিক সংখ্যায় বহিঃস্থ পরীক্ষা গ্রহণ করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, বর্ত্তমান রচনাধর্মী পরীক্ষায় পরীক্ষকের যে ব্যক্তিগত-অভিরুচি প্রকাশের সুযোগ আছে তাকে যথাসম্ভব কমাতে হবে। রচনা-ধর্মী পরীক্ষার নিজস্ব কতকগুলি মূল্য রয়েছে। এর সাহায্যে এমন কতকগুলি ক্ষমতার পরিমাপ করা যায় যা অন্যভাবে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ছাত্রদের যোগ্যতা বিচারের এটাই একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে এইজাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রের ভাষাগত প্রকাশভঙ্গীর উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যদিও এব্যাপারে যথেষ্ট ব্যক্তিবৈষম্য বর্ত্তমান থাকে। রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যক্তিগত-অভিরুচির বিষয়টি কমাবার জন্য এর পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার (Objective tests) প্রবর্ত্তন করতে হবে। এ ছাড়া পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রশ্নপত্রের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করতে হবে যাতে না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা রোধ করা যায় এবং কোন বিষয় ভালভাবে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা যায়। খুব খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়, ছাত্র সাধারণভাবে কোন বিষয়বস্তু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা জানাই হবে প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে একই দিনে তিন ঘণ্টা করে সময় লাগে এমন দুটি পেপারের পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলে কমিশন মনে করেন। পরিশেষে, কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা ছাত্রের চূড়ান্ত মূল্যায়ন (final assesment) করা ঠিক হবে না। অন্যান্য বিষয় যেমন আভ্যন্তরীন পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের দ্বারা রক্ষিত বিদ্যালয়ের রেকর্ডের উপরও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তবেই বহিঃস্থ পরীক্ষার দ্বারা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

বর্তমানে যেরূপ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা প্রচলিত আছে তারও কিছু পরিবর্তন করা দরকার। বাৎসরিক পরীক্ষার উপর বর্তমানে যে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হ্রাস করতে হবে। অল্প কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে এই জাতীয় পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়া হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ছাত্রের সারা বছরের অন্যান্য কাজকর্মের রেকর্ডও বিবেচনা করা হয়। কমিশনের মতে কেবল বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রকে প্রমোশন দেওয়া চলবে না, সেই সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রের অন্যান্য কাজকর্মের রেকর্ডও বিবেচনা করতে হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করতে হবে। রচনাধর্মী পরীক্ষার পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বহিঃস্থ পরীক্ষার অনুরূপ সংস্কার সাধন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা :—

কোন একটি স্তরে ছাত্রদের সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপূর্ণ চিত্র কেবল আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় না। কিন্তু ছাত্রের ভবিষ্যত পড়াশুনা কিংবা তার পেশা স্থির করার জন্য তার সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা দরকার। এইজন্য বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র দৈনন্দিন যেসব কাজকর্ম করে সারা বছর ধরে তার একটি রেকর্ড রাখা দরকার। এইরূপ রেকর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের বিভিন্নপ্রকার কাজের অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এইজাতীয় রেকর্ডে বিভিন্নপ্রকার আগ্রহ, প্রবণতা, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, যে সব সামাজিক কাজকর্মে সে অংশ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকবে। এককথায় ছাত্রের সমগ্র কর্মজীবনের চিত্র এতে থাকবে। আমাদের দেশের সমস্ত বিদ্যালয়কে এইজাতীয় রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন—

১। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পরীক্ষায় এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন-

প্রকার কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সংখ্যার দ্বারা মূল্যায়ন (numerical marking) করার পরিবর্তে প্রতীকচিহ্নের দ্বারা মূল্যায়ন (Symbolic marking) করা বাঞ্ছনীয়।

২। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কেবলমাত্র একটি সাধারণী পরীক্ষার (public examination) ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩। ছাত্রদের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে সাধারণী পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল, সাধারণী পরীক্ষায় যেসব বিষয় ছিল না সেইসব বিষয়ে বিদ্যালয়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রের যে রেকর্ড রাখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪। সাধারণী পরীক্ষায় কম্পার্টমেণ্টালের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন

(Improvement of the Teaching Personnel)

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কমিশন যেসব সুপারিশ করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১। সমস্ত রকম বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একই রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

২। সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে এবং লোকাল বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি ছোট সিলেকশন কমিটি থাকবে। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে ঐ কমিটির সদস্য থাকবেন।

৩। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষানবিশির সময় (period of probation) হবে এক বছর।

৪। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষায় (Education) ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কারিগরি শিক্ষকদের কারিগরি বিষয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

৫। একই প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একজাতীয় কাজে নিযুক্ত শিক্ষকেরা যে কোন প্রকার বিদ্যালয়েই কাজ করুন না কেন তাঁদের বেতনহার একরূপ হবে।

৬। সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতনহার সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করতে হবে এবং ঐ কমিটিকে জীবনযাত্রার

পরিবর্ত্তনশীল মানের উপযোগী ন্যায্য বেতনহার চালু করার জন্য সুপারিশ করতে হবে।

৭। নিজেদের এবং আশ্রিতদের ভবিষ্যত সম্পর্কে দুশ্চিন্তার হাত থেকে শিক্ষকদের রেহাই দেওয়ার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ট্রিপল-বেনিফিটের পরিকল্পনা (Triple Benefit Scheme) চালু করতে হবে।

৮। শিক্ষকদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা, সাসপেণ্ড করা প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য আরবিট্রেশন বোর্ড বা কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

৯। শিক্ষা অধিকর্ত্তার অনুমোদনক্রমে শারীরিক সক্ষমতা থাকলে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।

১০। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকদের সন্তানেরা বিনাবেতনে পড়বার সুযোগ পাবে।

১১। শিক্ষকেরা যাতে বিদ্যালয়ের কাছে বাস করে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মে অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন তার জন্য তাঁদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। যে সব শিক্ষক স্বাস্থ্যকর স্থান কিংবা হলিডে ক্যাম্পে যেতে চান কিংবা সেমিনার, শিক্ষা সম্মেলন ইত্যাদিতে যোগদান করতে চান তাঁদের যাতায়াতের ব্যাপারে কনসেশন ও ছুটির সুযোগ দিতে হবে।

১৩। শিক্ষকদের বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে।

১৪। সমস্ত বিদ্যালয়ের ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম একরূপ হবে।

১৫। শিক্ষকেরা যদি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে চান কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চান তাহলে তার সুযোগ দিতে হবে।

১৬। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রথার বিলোপ করতে হবে।

১৭। সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিদের শিক্ষক ও তাঁদের পেশার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে।

১৮। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কাজে যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হন তার জন্য উক্ত পদের আকর্ষণীয় বেতন হার চালু করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ ঃ

১৯। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দু ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকবে—(ক) যারা

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে তাদের জন্য ; এদের শিক্ষণকাল হবে দু'বছর। (খ) যারা গ্র্যাজুয়েট তাদের জন্য ; এদের শিক্ষণকাল বর্তমানে একবছর হলেও, ভবিষ্যতে দু'বছর করার চেষ্টা করতে হবে।

২০। গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এইসব শিক্ষককে ডিগ্রী প্রদান করবে। হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার একটি পৃথক বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২১। শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলীতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

২২। ট্রেনিং কলেজগুলিতে রিফ্রেসার কোর্স, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাগ্রহণ, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩। শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ট্রেনিংকলেজে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই কাজের জন্য এইসব কলেজের অধীনে ডেমনস্ট্রেশন স্কুল থাকবে।

২৪। ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা ট্রেনিং গ্রহণের পূর্বে চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন তাদের ট্রেনিং কলেজে পড়ার সময় পূর্বেকার বেতন হার বজায় রাখতে হবে।

২৫। প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের বসবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

২৬। শিক্ষায় মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তির জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের কমপক্ষে ৩ বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।

২৭। ট্রেনিং কলেজের প্রফেসর, কিছু সংখ্যক মনোনীত প্রধান শিক্ষক ও পরিদর্শকদের মধ্যে অবাধ আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২৮। শিক্ষিকাদের সংখ্যাল্পতা দূর করার জন্য বিশেষ আংশিক সময়ের ট্রেনিং কোর্স চালু করা উচিত।

পরিশাসনমূলক সমস্যা
(Problems of Administration)

সংগঠন ও পরিশাসন

১। শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Education) শিক্ষামন্ত্রিকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। তাঁর পদমর্যাদা একজন জয়েন্ট সেক্রেটারীর সমতুল্য হবে এবং তিনি সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন।

২। কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাজ্যে মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে এবং এই কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা-দপ্তরকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো।

৩। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের নিয়ে একটি কো-অরডিনেটিং কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির কাজ হবে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতি ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

৪। অনূর্ধ ২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (Board of Secondary Education) গঠন করতে হবে। শিক্ষা অধিকর্তা হবেন এই পর্ষদের চেয়ারম্যান। এই পর্ষদের কাজ হবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা।

৫। এই পর্ষদের অন্তর্ভূক্ত একটি সাব-কমিটি পরীক্ষা পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

৬। অবস্নাতকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এবং গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেবার জন্য একটি টিচার্স ট্রেনিং বোর্ড গঠন করতে হবে।

৭। শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সমস্যাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদকে (Central Advisory Board of Education) চালু রাখতে হবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরকে পরামর্শ দেবার জন্য প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রের অনুরূপ রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ (State Advisory Board) গঠন করতে হবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন (Inspection of Schools)

৮। বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রকৃত কাজ হল প্রতিটি বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি সামগ্রিক-ভাবে বিবেচনা করা। পরিদর্শককে বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে এবং শিক্ষকেরা যাতে তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারেন তার জন্য তাঁদের সাহায্য করতে হবে।

৯। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাদানকার্য পরিদর্শন করার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

১০। পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পরিদর্শকদের সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা ছাড়াও (১) দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, (২) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং (৩) ট্রেনিং কলেজের যোগতাসম্পন্ন শিক্ষক-দের মধ্য থেকেও পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এইসব ব্যক্তিরা ৩ কিংবা ৫ বছর পরিদর্শক হিসাবে কাজ করার পর আবার নিজ নিজ পদে ফিরে যেতে পারবেন।

১১। পরিদর্শকের কাজ ভালভাবে চালানোর জন্য সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

১২। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য পরি-দর্শকের সভাপতিত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

১৩। পরিদর্শকের সঙ্গে একত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষকদের মধ্য থেকে ৩ জনকে মনোনীত করতে হবে। এরা সকলে বিদ্যালয়ে ২/৩ দিন অবস্থান করে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অনুমোদনসংক্রান্ত সর্তাদি

১৪। উপযুক্ত মান বজায় রাখা ও সুপরিচালনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সর্তাদির ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে হবে।

১৫। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং বোর্ডকে রেজেষ্টীকৃত হতে হবে

এবং এই বোর্ডে অল্প সংখ্যক সদস্য থাকবেন। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এই বোর্ডের সদস্য হবেন।

১৬। ম্যানেজিং বোর্ডের কোন সদস্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

১৭। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চাকুরী সংক্রান্ত নিয়মকানুন রচনা করতে হবে—এতে বেতন, ছুটি ইত্যাদি ব্যাপারে সুস্পষ্ট সর্তাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

১৮। বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি রাখতে হবে এবং ঐ সম্পত্তির আয় হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৯। বিদ্যালয় কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট ছাত্রদের বেতন হার শিক্ষা দপ্তরের দ্বারা অনুমোদিত হবে।

২০। ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফী'র হার একই প্রকার করার জন্য শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনবোধে একটি কমিটি নিয়োগ করবেন এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন।

২১। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তরের নিয়মকানুন অনুযায়ী যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২২। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থান সঙ্কুলান (accommodation) ও আসবাব পত্র সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

২৩। কোন শ্রেণীর বিভাগের (Section) সংখ্যা খুব বেশী হবে না এবং নতুন বিভাগ খোলার আগে শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে।

২৪। পাশাপাশি অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য নিয়মকানুন রচনা করতে হবে।

২৫। শিক্ষকদের নিয়োগ কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না।

২৬। বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার জন্য নতুন ও পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হবে।

২৭। বিদ্যালয় স্থাপন করার আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সর্তাদি পূরণ না করলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাব পত্র (**School Building and Equipment**).

২৮। গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৯। শহরাঞ্চলে যেখানে খুব গোলমাল ও ভীড় নাই এমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩০। শহরের ফাঁকা জায়গাগুলি যাতে বিদ্যালয়সমূহের খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত জায়গাগুলি যাতে বেদখল না হয়ে যায় তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩১। বিদ্যালয়ের নক্সা প্রস্তুত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য শ্রেণীকক্ষে কমপক্ষে ১০ বর্গ ফুট জায়গা থাকে।

৩২। প্রতিটি শ্রেণীতে ৩০ জন করে ছাত্র থাকবে এবং কোনমতেই এই সংখ্যা ৪০ এর বেশী হবে না। সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হবে ৫০০ এবং কোনক্রমেই এই সংখ্যা ৭৫০ এর বেশী বাড়ানো চলবে না।

৩৩। ভবিষ্যতে যে সব স্কুল স্থাপিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৩৪। বিদ্যালয়ের গৃহের নক্সা, আসবাবপত্রের গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষনা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সেগুলির কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং সেগুলি ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী হয়।

৩৫। বিভিন্ন প্রকার বহুমুখী কোর্স ও ওয়ার্কশপের উপযোগী আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তার মূল্য নির্দ্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

৩৬। প্রতেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগে এরূপ অন্যান্য ষ্টেশনারী দ্রব্য ন্যায্য মূলে বিক্রয় করার জন্য কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপন করতে হবে।

৩৭। যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষকদের বাসগৃহ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়ে যৌথ সমাজজীবন গড়ে তোলার সুবিধা হবে।

বিদ্যালয়ের কার্যকাল ও দীর্ঘাবকাশ

(Hours of work and Vacations)

৩৮। আঞ্চলিক সুবিধা অসুবিধা, স্থানীয় জলবায়ু ও অধিবাসীদের পেশার কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়গুলি যাতে নিজ নিজ কার্যকাল নির্দ্ধারণ করতে পারে তার জন্য তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩৯। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের কাজের দিনের (working day) সংখ্যা হবে কমপক্ষে ২০০ এবং সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা হবে কমপক্ষে ৩৫ পিরিয়ড, প্রত্যেক পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য হবে ৪৫ মিনিট।

৪০। বিদ্যালয়ের ছুটির দিন ও সরকারী ছুটির দিন একই প্রকারের নাও হতে পারে ; সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে বছরে ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ এবং অন্য কোন উপযুক্ত সময়ে দশ থেকে পনর দিনের ছুটি অবকাশ দিতে হবে।

সরকারী চাকরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা

(Recruitment to Public Service)

সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বর্ত্তমান পদ্ধতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জাতীয় চাকরীতে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৫ বছর হওয়ায় ম্যাট্রিকুলেট ও গ্র্যাজুয়েট সকলেই একই প্রকার চাকরীর জন্য পাবলিক সারভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে চাকরীর আশায় অনেককে বাধ্য হয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। শিক্ষার উপর এই জাতীয় নিয়োগ প্রথার কুফলের কথা বিবেচনা করে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন—

৪১। সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বয়স পর্যায়ক্রমে ১৬ থেকে ১৮ বছর, ১৯ থেকে ২১ বছর ও ২২ থেকে ২৪ বছর হবে।

৪২। প্রথমে কিছুদিন যাবত উপরোক্ত নিয়মে শতকরা ৫০ ভাগ এবং প্রচলিত নিয়মে বাকী ৫০ ভাগ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অনুপাত ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।

৪৩। সরকারী চাকরীতে নিয়োগপদ্ধতির উন্নতিসাধন করার জন্য এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী যাতে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

অর্থসংস্থান
(Finance)

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থসংস্থান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে।

২। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রক থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি বোর্ড গঠন করতে হবে।

৩। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প-শিক্ষা কর (Industrial Education Cess) নামে একটি কর বসাতে হবে।

৪। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা রেলওয়ে, যোগাযোগ দপ্তর, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের কিছু অংশ ব্যয় করতে হবে।

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রদত্ত অর্থ ইনকাম-ট্যাক্স আইনের আওতা থেকে বাদ যাবে।

৬। ধর্মীয় ও দাতব্য সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে।

৭। কোন মৃত ব্যক্তি যদি শিক্ষার প্রসারের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উইল মারফৎ অর্থ দান ক'রে যান তাহলে কেন্দ্র সেই অর্থের উপর কোন প্রকার কর বসাতে পারবে না।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন জমি সম্পত্তি কর থেকে মুক্ত হবে।

৯। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্ভব হলে বিদ্যালয়কে খেলার মাঠ; বিদ্যালয় গৃহ প্রভৃতির জন্য জমি দান করবেন।

১০। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ও বই কেনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ শুল্ক দিতে হবে না।

১১। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পিত পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে হবে।

সমলোচনা :

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের কতকগুলি সুপারিশ তদানীন্তন মাধ্যমিক শিক্ষা-বব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়-

গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা মূলতঃ গ্রন্থকেন্দ্রিক। তার পরিবর্তে বহুসাধক বিদ্যালয়ের (Multipurpose School) পরিকল্পনা করে কমিশন ছাত্রদের রুচি, প্রবণতা, ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কমিশন কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি কমিশনের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্জন করে কমিশন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনমতেই সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে বাস্তব জীবনের উপযোগী হতে পারে তার জন্য কমিশন এই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণকালে ছেলেমেয়েদের চরিত্র যাতে ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য কমিশন চারিত্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান বিশৃঙ্খলার যুগে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন তাঁদের দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এক কথায় বলতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনই সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একাদশ শ্রেণীর বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য যে নতুন পরিকল্পনা রচনা করেছেন সেটি যে সব দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত একথা বলা চলে না। প্রথমতঃ এই পরিকল্পনায় অষ্টম শ্রেণীর শেষে ছাত্রকে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাতটি পাঠপ্রবাহের (যথা মানবতত্ব, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান) মধ্য থেকে যে কোন একটি পাঠপ্রবাহ বেছে নিতে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এত অল্প বয়সে ছাত্র কর্তৃক তার ভবিষ্যত বৃত্তি পাকাপাকিভাবে নির্বাচন করে নেওয়াকে যথেষ্ট মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন না। কারণ সঠিকভাবে পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করতে না পারলে ছাত্রের জীবনে তার ফল মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে এবং সারা

জীবন তাকে তার সামর্থ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যত কর্মজীবন অতিবাহিত করতে হবে। পাঠপ্রবাহ নির্বাচন ব্যাপারে ছাত্রকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় কমিশন সে সম্পর্কে আলোচনা করলেও এ ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য দেশের ন্যায় বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষা উদ্ভাবন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ফলে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য অনেকটা ভাসা ভাসা রয়ে গেছে।

কমিশন যে ধরণের বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছেন নিঃসন্দেহে তা খুবই ব্যয়বহুল। কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ায় দেশের সর্বত্র একই ধরণের বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বহু বছর সময় লাগবে। এই দীর্ঘ দিন ধরে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় ও বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি অবস্থান দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জগতে একটি শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করে রাখবে। এই কারণে কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের এই পরিকল্পনাকে অনেকে যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই জাতীয় পরিকল্পনার পরিবর্তে প্রচলিত দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হলে কমিশন বোধ হয় অধিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন।

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কমিশন বেতনহার, চাকরীর সর্তাদি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করলেও বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারে যে নানাবিধ অসুবিধা রয়েছে এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের সমগ্র পরিকল্পনাটিই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে সে সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে গণ্য না করে এই স্তরটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার যে পরিকল্পনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে খুবই যুক্তিপূর্ণ। কমিশনের মতে বর্তমানে যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় তাদের শিক্ষার মান খুব নীচু এবং তাদের গড় বয়সও কিছুটা কম। সেইজন্য কমিশন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে আরও এক বছর যোগ করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের এই একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সমালোচনা

করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ১৯৬২ সালে প্রক্ষোভমূলক সংহতি বিষয়ক কমিটি (Committee on Emotional Integration) মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য এগার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও এক বছর বৃদ্ধি করা উচিত। ১৯৬৪ সালে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনেও এই মত সমর্থিত হয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন কমিশন ও কমিটিই এগার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাকে সমর্থন করেননি।

কমিশন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংগঠন সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তাতে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারের কর্ত্তৃত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষা পর্ষদ অনেকটা উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। অনেক শিক্ষাবিদের মতে এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা যান্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে।

উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই ভারত সরকার বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ ঘটে এবং বহুসংখ্যক একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে ভারত সরকার প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনায় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

———

শিক্ষা কমিশন

বা

কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট

১৯৬৪—১৯৬৬

[সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

ভূমিকা

ভারত সরকার ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই একটি প্রস্তাবনার দ্বারা শিক্ষা কমিশন (Education Commission) নিয়োগ করেন। শিক্ষার একটি জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে নির্দ্দেশ দান করাই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। ইউনিভারসিটি গ্রান্টস্ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. এস্. কোঠারি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামেও সুপরিচিত। ভারতবর্ষ ও বিদেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া একজন সম্পাদক ও একজন সহসম্পাদক নিয়ে এই কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন। কমিশন ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর কাজ শুরু করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন।

ইতিপূর্বে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেসব কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল সেগুলির কর্মপরিধি আলোচ্য কমিশনের ন্যায় এত ব্যাপক ছিল না। শিক্ষার কোন একটি বিশেষ স্তর কিংবা কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা করাই ছিল পূর্ববর্ত্তী কমিশনগুলির উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার ভার দেওয়া হয়েছিল কোঠারি কমিশনের উপর। আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া শিক্ষার আর সমস্ত বিভাগ সম্পর্কে কমিশনের মতামত চাওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্য এইজাতীয় একটি কমিশন নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কোঠারি কমিশনের সুবৃহৎ রিপোর্টটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি অধ্যায়ে সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস (reorientation) কাঠামোগত পুনর্গঠণ, শিক্ষকদের উন্নতিসাধন, ছাত্রভর্ত্তি সংক্রান্ত নীতি-নির্দ্ধারণ এবং সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদান —এই সমস্ত বিষয়গুলি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত! দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ১১টি অধ্যায়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও সেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ২টি অধ্যায়ে কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড

সাধারণ সমস্যাসমূহ

কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষাসংক্রান্ত পুনর্গঠনের যে কার্যসূচীর কথা বলা হয়েছে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) জাতীয়জীবনের, চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ রূপান্তর সাধন।

(২) শিক্ষার গুণগত উন্নতিসাধন, যাতে শিক্ষার মান আশানুরূপ হয়, এই মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে।

(৩) মানবিক সম্পদের চাহিদার ভিত্তিতে এবং সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ।

কমিশনের রিপোর্টের এই খণ্ডে উপরোক্ত তিনটি কার্যসূচীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্য

ভারতের ভবিষ্যত ভাগ্য রূপ পরিগ্রহ করছে তার শ্রেণীকক্ষগুলিতে; নিছক অলঙ্কার প্রয়োগের জন্যই যে একথা বলা হচ্ছে তা নয়। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে কেবলমাত্র শিক্ষাই জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে বিরাট জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ থেকে কত সংখ্যক এবং কিরূপ গুণসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে তার উপর। সেইজন্য জাতীয় উন্নয়নের সমগ্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং এই পরিকল্পনাকে দৃঢ় সংকল্প ও উদ্যমের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।

যদি জাতীয় উন্নতিকে তরান্বিত করতে হয় তাহলে সুপরিকল্পিত, বলিষ্ঠ এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষার পুনরুজ্জীবন,

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বিপুল উদ্যমের সঙ্গে তা কার্যে পরিণত করতে হবে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। শিক্ষা হবে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম। সেইজন্য একদিকে জাতীয় অগ্রগতির দীর্ঘকালীন কর্মসূচী ও অপরদিকে দেশের বর্তমান স্বল্পকালস্থায়ী জটিল সমস্যাদির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা

দেশের বর্তমান জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ হল খাদ্য সমস্যা। আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই খাদ্য সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। আমাদের দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ খুব সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া এই আয়ও জনগনের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয়নি। আমাদের দেশের শতকরা ৩০ জনের মাসিক আয় ১৫ টাকারও কম। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে হবে, জাতীয় আয় যাতে সমভাবে বন্টিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে এবং এই বৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কোন কোন ঘটনার ফলে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে চলেছে। স্থানীয়, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও প্রাদেশিক আনুগত্য বর্তমানে এমন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার কথা যেন লোকে ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে। পুরাতন মূল্যবোধ ক্রমশঃ অদৃশ্য হচ্ছে, কিন্তু তার স্থলে সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে না। ধর্মঘট, ক্রমবর্দ্ধমান অরাজকতা, জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, দুর্নীতিপরায়ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য সামাজিক বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কথা প্রায়ই বলা হয় তা এই সব উপসর্গের মধ্যে একটি এবং সম্ভবত খুব মারাত্মক ধরণের উপসর্গ নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজটি নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ।

রাজনৈতিক দিক থেকে যে তিনটি প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হল (১) গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সমস্যা (২) দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার সমস্যা ও (৩) যারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিল তাদের শিক্ষা, সাম্য, জীবন-যাত্রার উন্নতমান ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার দাবীকে পূরণ করার সমস্যা। আন্তর্জাতিক দিক থেকেও আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের :দেশের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মানের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উক্ত দেশগুলিতে যেভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে তাতে এখনই যদি আমরা দেশের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তাহলে কোনদিনই আমরা তাদের সমকক্ষ হতে পারবো না। তাছাড়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে ভারতবর্ষকেও তার যোগ্য অবদান রাখতে হবে। সেইজন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কতকগুলি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন

মানবিক সম্পদের বিকাশ সাধন :

উপরোক্ত জটিল, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও জরুরী সমস্যাগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং ঐ সমস্যাগুলি সমাধানের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা হল একই সঙ্গে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করা। দুটি প্রধান কর্মসূচীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালাতে হবে : (১) কৃষির আধুনিকীকরণ ও শিল্পের দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশসাধন এবং

(২) শিক্ষার সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর মাধ্যমে মানবিক সম্পদের বিকাশসাধন।

উপরোক্ত দুটি কার্যসূচীর মধ্যে দ্বিতীয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবিক সম্পদের বিকাশ না ঘটলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। কৃষকেরা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোকে তাদের বহুযুগ অনুসৃত রক্ষণশীলতা ত্যাগ করতে না পারে; তারা যদি উৎপাদন বাড়াবার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে আগ্রহী না হয় তাহলে দেশকে কখনই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাবে না। শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা চালাবার জন্য এবং গবেষণা লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য যে দক্ষ মানবশক্তির প্রয়োজন তা কেবল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি

শিক্ষার উন্নতি দ্বারা লাভ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা দক্ষ কারিগর সৃষ্টির দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করা যায় না; এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা ও কর্মের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করা। অর্থনৈতিক উন্নতি প্রধানত নির্ভর করে "ব্যাপক আকারে মানবীয় পরিবর্ত্তন" সাধনের উপর।

একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতীয় মানবীয় পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে সাহায্য করে ঠিকই; কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমগ্র জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হতে পারে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হলে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি, উৎসর্গীকৃত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ। জাতীয় সমস্যাগুলির যথাযথ মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করার অর্থ এই নয় যে এর দ্বারা ব্যক্তির মূল্যকে ছোট করে দেখতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিকে তার সম্ভাব্য কর্মশক্তির (potentiality) পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বাধিক সুযোগ দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থায় যে মূলনীতিটির উপর জোর দেওয়া উচিত তা হল সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপরভাবে ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠিগত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত আশা অকাঙ্খার পূরণ ঘটবে না, তার পরিবর্তে জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যক্তি যদি নিজেকে উৎসর্গ করে তবেই তার আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হবে।

শিক্ষা বিপ্লব

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে যখন গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে সুসংগঠিত করে তোলা যাবে তখনই কেবল শিক্ষা ও জাতীয় সমৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। পরিমাণের দিক থেকে সমাজের সর্ব-স্তরের লোককে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে। আর গুণগতভাবে শিক্ষাকে উচ্চমানসম্পন্ন হতে হবে যাতে এই শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ্য মানব-শক্তির সৃষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইহা অপরিহার্য।

এইদিক থেকে বিচার করলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার যাতে এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী হতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর

মধ্যে। কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-পদ্ধতি, বিভিন্ন কর্মসূচী, ছাত্র সংস্থার আয়তন, শিক্ষকদের নির্বাচন ও পেশাগত প্রস্তুতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠনের ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বস্তুত শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে যার প্রভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হবে। কমিশন এই শিক্ষা বিপ্লবের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন—

(১) শিক্ষা ব্যবস্থার আভ্যন্তরীন পরিবর্তন সাধন—যার ফলে জাতীয় জীবন, চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(২) শিক্ষার মানের গুণগত উন্নতিসাধন—যাতে শিক্ষার মান আশানুরূপ হয়, এই মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে।

(৩) শিক্ষাগত সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ- যাতে দেশের মানবিক কর্মশক্তির চাহিদা মিটতে পারে এবং সকলে সমানভাবে শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা লাভ করতে পারে।

জাতীয় জীবন, চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন :

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। **প্রথমত,** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কৃষি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। **দ্বিতীয়ত,** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় তত্ত্বমূলক (academic) তার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ অবদান নেই। **তৃতীয়ত,** জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে সে সম্পর্কে স্কুল কলেজগুলি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষক ও ছাত্রদের কোন ভূমিকা নেই। **চতুর্থত,** সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিভেদমূলক প্রবণতাগুলিকে বাড়িয়ে তুলছে। **পঞ্চমত,** বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র-গঠনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা

হচ্ছে না। ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা কিংবা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ ও প্রবণতা গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনরূপ প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কমিশনের মতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। কারণ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু হালে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তাতে এক শত বছর পূর্বেকার শিক্ষা ব্যবস্থার যে চরিত্র ছিল তাই পুরোপুরি বজায় আছে।

কমিশনের মতে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হলে (১) উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে (২) শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় সংহতি এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলবে; (৩) আধুনিকীকরণকে ত্বরান্বিত করবে এবং (৪) সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে শিশুর চরিত্রগঠনে সচেষ্ট হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়ায় এদের সবগুলি এক সাথে লাভ করার চেষ্টা না করলে কোনটিই লাভ করা যাবে না।

শিক্ষা এবং উৎপাদন

ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে মুষ্টিমেয় লোক শিক্ষার সুযোগ পেয়ে এসেছে, বর্তমানে সমস্ত জনসাধারণ যাতে এই সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজের জন্য যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন তা পেতে হলে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার প্রসারের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে। এইভাবে শিক্ষা ও উৎপাদন পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে চলবে। এরজন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন—

(১) বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার;

(২) কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রবর্তন;

(৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং

(৪) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং গবেষণার ব্যবস্থা।

১। **বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার**—গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, আর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কৃষি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের একটি শাখাতে পরিণত হয়েছে। এইদিক থেকে বিচার করলে বর্তমানে বিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মানও যথেষ্ট উন্নত করতে হবে যাতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যাতে এর দ্বারা ছাত্রেরা সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তাদের বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, এবং তাদের মধ্যে জানবার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র এইভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান গোঁড়ামিকে দূর করে, এর সাহায্যে ভয়, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ এবং নিষ্ক্রিয়তা অপসৃত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাহায্যে মানুষ আপনাকে জানতে শিখছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার স্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় ঘটছে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার বিশেষ মূল্য রয়েছে।

২। **কর্ম অভিজ্ঞতার (Work Experience) প্রবর্তন—**

জীবন এবং উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কর্ম অভিজ্ঞতার প্রবর্তন করতে হবে। কমিশনের মতে কর্ম-অভিজ্ঞতার অর্থ হল বিদ্যালয়ে, গৃহে, ওয়ার্কশপে, ফার্মে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্য যে কোন উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদনমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা। কমিশনের মতে সমস্ত প্রকার উন্নত ধরণের শিক্ষার কমপক্ষে ৪টি উপাদান থাকা উচিত—(ক) আক্ষরিক জ্ঞান (literacy) বা ভাষা, মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের চর্চা ; (খ) গাণিতিক জ্ঞান (numeracy) বা অঙ্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের চর্চা, (গ) কর্ম অভিজ্ঞতা এবং (ঘ) সমাজ সেবা।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথমোক্ত দুটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ নয়। আর শেষোক্ত দুটি বিষয় বিশেষভাবে অবহেলিত—এর মধ্যে প্রথমটি শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করে আর দ্বিতীয়টি সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের সহায়তা করে।

প্রথাবদ্ধ শিক্ষা শিশুকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং একটি কৃত্রিম পরিবেশে ভবিষ্যতে সমাজজীবনের অংশগ্রহণ করার উপযোগী ক'রে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এইভাবে কর্মজগৎ ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রবর্তনের মাধ্যমে এই ব্যবধান দূর করা সম্ভব হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম-অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কমিশনের মতে কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এর সাহায্যে বৌদ্ধিক ও দৈহিক শ্রমের মূল্যকে পৃথক করে দেখার যে প্রবণতা তা দূর হবে। যুবকেরা শ্রম-মূলক কাজে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারবে এবং ছাত্রদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটবে। কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতার কার্যসূচী যদি সুপরিকল্পিত হয় তাহলে এর দ্বারা ছাত্র কিছু না কিছু রোজগার করতে পারবে এবং তার দ্বারা সে আংশিকভাবে তার পড়ার খরচ মেটাতে পারবে।

৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা—

শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ সুযোগ না থাকায় পরীক্ষায় পাশ করেও বহু সংখ্যক ছাত্রকে বেকার জীবন যাপন করতে হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে যত ছাত্র পড়াশুনা করে তার মধ্যে মাত্র শত করা ৯জন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে—যাতে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কিছুটা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যেও কিছুটা সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যাতে পেশাগত শিক্ষার প্রসার ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৪। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং গবেষণার ব্যবস্থা—জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে ইনজিনীয়ারিং, কৃষি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে যাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে যথেষ্ট উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় সংহতি

দেশকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হবে। জাতীয় সংহতি স্থাপিত না হলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই জাতীয় সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন (১) জাতীর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা; (২) জনগনের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি; বেকার সমস্যার সমাধান; দেশের বিভিন্ন অংশের উন্নতির ব্যাপারে যে অসমতা রয়েছে তা দূর করা—এর ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে জনসাধারণের মধ্যে সমান সুযোগলাভের ধারণা গড়ে উঠবে; (৩) নাগরিকতার মূল্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এবং খণ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি আনুগত্য; (৪) উৎকৃষ্ট ও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা এবং সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমান্ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি; (৫) দেশের বিভিন্ন অংশের লোকদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।

বর্তমানে আমাদের দেশে যেসব ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেগুলির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে না পারলে দেশের সামাজিক ও মনস্তাত্বিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যাবে না। আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র, সুবিধাভোগকারী ও প্রবঞ্চিত, সহরাঞ্চলের অধিবাসী ও গ্রামের অধিবাসী এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে। কাজেই উপরোক্ত বিভেদ দূর করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত কার্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—(ক) সাধারণ বিদ্যালয়ের

(Common School) প্রতিষ্ঠা ; (খ) শিক্ষার সর্বস্তরে সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজকে শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা ; (গ) সমস্ত আধুনিক ভাষার বিকাশ সাধন এবং হিন্দী যাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে তার জন্য উক্ত ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (ঘ) জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন।

ক। **সাধারণ বিদ্যালয়**—আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর হয়। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতে সামাজিক বিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক হলেও এগুলির মান অনুন্নত এবং এগুলিতে দরীদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। কিছু কিছু বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল হলেও সেগুলির বেতন খুব বেশী এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সেগুলিতে পড়াশুনা করে। মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ উন্নতধরণের স্কুলগুলি বেসরকারী এবং সেগুলিতে বেতনের পরিমান এত বেশী যে 'সমাজের উপরতলার শতকরা দশ ভাগ লোকেদের ছেলেমেয়েরাই সেগুলিতে পড়ার সুযোগ পায়। শিক্ষার জগতে এই শ্রেণীবৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই জাতীয় শ্রেণী-বৈষম্য দূর করতে হলে এবং শিক্ষাকে সামাজিক ও জাতীয় সংহতির বাহন করে তুলতে হলে সাধারণ বিদ্যালয় প্রথার (Common School System) প্রবর্তন করতে হবে। এই বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য হলে নিম্নরূপ :

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল শিশু এই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে।

২। সুশিক্ষার সুযোগ অর্থ বা শ্রেণীর উপর নির্ভর না ক'রে প্রতিভার উপর নির্ভর করবে।

৩। এইজাতীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের মান উন্নত হবে এবং খুব উন্নতমানের বেশ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় থাকবে।

৪। এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে বেতন গ্রহণ করা হবে না।

৫। সাধারণ পিতামাতারা এই বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন এবং ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন না।

রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশগুলিতে এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল নামে যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলি উন্নতমান সম্পন্ন হলেও যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং বেসরকারী। ইংরেজরা আমাদের দেশে কতকটা এইজাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থারই প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি তার পক্ষে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই অনুপযোগী।

খ। সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজ—

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। সেইজন্য কমিশন শিক্ষার সকল স্তরে যাতে ছাত্রেরা আবশ্যিকভাবে সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তারজন্য সুপারিশ করেছেন। এর ফলে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হবে, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগবে, তারা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হবে এবং তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশ হবে।

সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজের আয়োজন দু'ভাবে করা যেতে পারে। **প্রথমত**, শিক্ষাগ্রহণকালে ছাত্রেরা মাঝে মাঝে আংশিক সময়ের জন্য এই কাজে অংশগ্রগণ করতে পারে এবং **দ্বিতীয়ত**, হায়ার সেকেণ্ডারী কিংবা প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষা পাশ করার পর নয় থেকে বার মাস ধ'রে ছাত্রেরা পূর্ণ সময়ের জন্য জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে। সি. ডি. দেশমুখের সভাপতিত্বে গঠিত ন্যাশানাল সার্ভিস কমিটি শেষোক্ত কর্মসূচীর পক্ষে ছিলেন।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সমাজ সেবার জন্য অতিরিক্ত এক বছর যোগ করার পক্ষপাতী নন। কমিশনের মতে স্কুল ও কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজ সেবার কাজও চলতে থাকবে এবং উচ্চতর প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সমাজ সেবার কর্মসূচী চলতে থাকবে।

সমাজ সেবার কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে—(১) স্কুল ও কলেজে ছাত্রেরা যাতে যৌথ জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা; এবং (২) জাতীয় সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচীতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।

১। **স্কুল কলেজে যৌথ জীবনযাপন**—স্কুল কলেজে ছাত্রদের যৌথ জীবনযাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, হোষ্টেলে সর্বত্রই যাতে যৌথ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং হোষ্টেলগুলিতে চাকরেরা যেসব কাজ করে সেগুলি ছাত্রদের দিয়ে করানো যেতে পারে এবং এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তারা মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। এইভাবে তাদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হতে পারে।

২। **সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ**—স্কুল কলেজে যৌথ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যাতে স্কুল কলেজের বাইরে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই কর্মসূচীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ—

(ক) প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়কে সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসতে হবে এবং সম্ভবমত সমাজ সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে এবং সমাজ সেবার সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বছরে মোট ৩০ দিন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ২০ দিন এই জাতীয় কর্মসূচীতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন।

(গ) কলেজ স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম স্নাতক ডিগ্রী পাবার আগে একবার থেকে তিনবারের মধ্যে মোট ৬০ দিন জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ক্যাম্প কিংবা এন-সি-সি-তে অংশগ্রহণ উপরোক্ত কাজের বিকল্পরূপে গণ্য হবে।

গ। **ভাষা সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণ**—কমিশনের মতে সঠিক ভাষা-নীতি অবলম্বন করতে পারলে, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের সামনে যত সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে ভাষাসমস্যা একটি বিশেষ জটিল সমস্যা। এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করতে হলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতিসাধনের সর্ব-প্রকার চেষ্টা করতে হবে। এই ভাষাগুলির উন্নতি হলে জনসাধারণ নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন এবং দেশের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করতে পারবে। সেইজন্য আঞ্চলিক

ভাষায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক রচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। স্কুল ও কলেজে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের পক্ষে কোন বিষয় আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টকর হয়ে পড়ে। 'ইমোশনাল ইনটিগ্রেশন' কমিটির মতে শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে তা জাতীয় সংহতি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হবে। ভাষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতি সাধনের সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। ইংরাজী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবহেলা করা চলবে না।

২। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যম স্থির করার ব্যাপারে ইউ. জি. সি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করবে এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হবে। এইজন্য ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় সাহিত্য রচনা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল ও অনির্দিষ্ট ভাষানীতি পরিহার করতে হবে।

৪। শিক্ষাদানের মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটাবার সময় শিক্ষার মানেরও যাতে অবনতি না হয় তার জন্য উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে অযথা কালক্ষেপ করা চলবে না।

সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে ভারতের বিভিন্ন অংশের ছাত্রেরা পড়াশুনা করে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে আপাততঃ বজায় রাখতে হবে। তবে হিন্দী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটলে এবং অহিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলি সমর্থন করলে ভবিষ্যতে ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম করা চলতে পারে।

আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে যারা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে তারা সরকারী উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত না হয়। বর্তমানে যে সব চাকুরী পেতে হলে ইংরাজীর জ্ঞান বিশেষভাবে দরকার হয় সেই সব চাকুরী যদি আঞ্চলিক ভাষার জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায় তাহলে আঞ্চলিক ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা সহজ হবে। এই প্রসঙ্গে কমিশন উর্দু ভাষার

উন্নতির জন্য উৎসাহ দেবার কথা বলেছেন কারণ ভারতের বিভিন্ন অংশের লোকেরা এই ভাষায় কথা বলে এবং হিন্দীর সঙ্গে উর্দ্দুর ঘনিষ্ট যোগাযোগও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম— ভাষা সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব কমে যাবে। প্রথম স্নাতক ডিগ্রী লাভ করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে যাতে সে মনের ভাব সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারে, ঐ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা বুঝতে পারে এবং উক্ত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে। সেইজন্য বিদ্যালয় স্তর থেকেই যাতে ছাত্রেরা ভালভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় 'পাঠাগার ভাষা' (Literary Language) এবং আমাদের কাছে এই ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাতায়নের (Window of the world) কাজ করবে।

এ ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশ ভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ফরাসী, জার্মান, জাপানী, স্প্যানিশ ও চীনদেশীয় ভাষাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিছু কিছু নির্বাচিত কলেজে ও স্কুলে এইসব ভাষা শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ করেছেন। ডক্টরেট ডিগ্রী ও কোন কোন বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভের জন্য ইংরাজী ছাড়া আরও একটি বিদেশী ভাষা (বিশেষ করে রুশ ভাষা) শিক্ষা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাদের দেশে উপরোক্ত ভাষা-গুলিতে দক্ষতাসম্পন্ন অধিক সংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে। এইজন্য এমন কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যেখানে প্রথম থেকেই উক্ত ভাষাগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং ঐ ভাষাগুলির মাধ্যমেই সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে। এইসব বিদ্যালয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদেরই কেবল ভর্ত্তি করা হবে।

কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার

জন্য বিশ্ববিত্যালয় স্তরে কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বলেছেন যেখানে কতকগুলি আন্তর্জাতিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে। নয়াদিল্লীতে ইনষ্টিটিউট অব রাশিয়ান ষ্টাডিজ এই ব্যবস্থার সূচনা করেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ ও জাপানী ভাষায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। এইসব প্রতিষ্ঠান হবে আবাসিক এবং এগুলি স্থানীয় বিশ্ববিত্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হবে।

আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম

হিন্দী কিংবা অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে পাঠাগার ভাষায় (Literary language) উন্নীত করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে তার বিকাশ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠাগার ভাষা বলতে কমিশন এমন একটি ভাষাকে বোঝাতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে সাম্প্রতিক ও ক্রমবর্দ্ধমান আন্তর্জাতিক জ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ আয়ত্ত করা যায়। বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রের ক্ষেত্রে ইংরাজীই এই পাঠাগার ভাষার স্থান দখল করেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক কাজকর্ম ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যাপারে এই ভাষা সংযোজক ভাষা (Link Language) হিসাবেও ব্যবহৃত হবে।

কমিশন মনে করেন যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ইংরাজীকে সংযোজক ভাষারূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। কালক্রমে হিন্দীকে এই স্থান গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষা এবং জনগণের সংযোজক ভাষা, সেইজন্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সেখানকার লোকেরা স্বেচ্ছায় এই ভাষাকে গ্রহণ করতে পারে।

হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি যাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিত্যালয়ে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিভাগ খুলতে হবে এবং তুলনামূলক ভাষা শিক্ষার জন্য অল্প কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

ঘ। **জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন**—ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের

মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে সে সম্পর্কে স্কুলে ও কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় চেতনা জাগানোর পরিবর্তে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হত। স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজবিরোধী মনোভাব জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে নিস্পৃহ মনোভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় জাতীয় চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কমিশনের মতে এইজাতীয় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষকে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির স্বাভাবিক উপায় বলে মনে করা উচিত নয়। কেবলমাত্র শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকৃত জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কমিশন এর জন্য দুটি কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন (১) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপলব্ধি এবং তার পুনর্মূল্যায়ন, এবং (২) আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির প্রতি অবিচল আস্থা সৃষ্টি করা।

প্রথমোক্ত কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে ভারতের বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে সুপরিকল্পিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া পাঠক্রমে ভারতের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কিত তথ্যাদির সমাবেশ ঘটাতে হবে. শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, এবং আন্তঃরাজ্য ভিত্তিতে অবকাশ শিবির (holiday camp) স্থাপন ও গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়োক্ত কর্মসূচীতে নাগরিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণাপ্রদান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রেরা যাতে আধুনিক আন্দোলন ও প্রবণতার মূল্য বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষা

জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষাও দিতে হবে। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিদেশের প্রতি

নিন্দাসূচক উক্তি আর বিশেষ দেখা যায় না। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান UNESCO র প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আরও কিছু করার আছে। মানবিক বিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করতে হবে যাতে ছাত্রেরা ঐসব বিষয় থেকে সুযোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং বহির্বিশ্ব সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে পার্শ্ববর্তী আফ্রো-এশীয় দেশগুলি সম্পর্কে মৈত্রীভাবাপন্ন হতে পারে। যদি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করার শিক্ষা পায় তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তারা বিভিন্ন দেশের মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সূত্রটি সহজেই আবিষ্কার করতে পারবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ

আমাদের দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে যেসব বৈষম্য রয়েছে সেগুলি দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী, সহিষ্ণুতা, অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণাবলীর অনুশীলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ঘটতে পারে।

শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ—বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হলে ভারতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কারিগরিবিদ্যার প্রবর্তন করতে হবে। এর ফলে উৎপাদনের হার যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তেমনই দেশের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেবে। সমাজের এই জাতীয় পরিবর্তনকেই আধুনিকীকরণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আধুনিকীকরণের ফলে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং সমাজের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমান যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানভাণ্ডার যে হারে সমৃদ্ধ হচ্ছে তাকে আমরা 'জ্ঞানের বিস্ফোরণ' বলে আখ্যা দিতে পারি। এই জ্ঞানের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের ছাত্রদের জ্ঞান-ভাণ্ডার যাতে বাড়তে পারে শিক্ষাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। এই আধুনিকীকরণকে যদি আমরা স্বীকার করে নিই তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমাজের সর্বস্তরে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেবে তাকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

জীবনে যে সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার প্রসার যত দ্রুত হবে আধুনিকীকরণও সেই অনুযায়ী ত্বরান্বিত হবে। শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের দেশ বর্তমানে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার না ঘটলে আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। বর্তমানে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ মাত্র। কাজেই একদিকে যেমন এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি সমাজের সর্বস্তরের লোককে শিক্ষিত করার দিকেও নজর রাখতে হবে। বর্তমানে মানবিক বিদ্যার চর্চ্চার তুলনায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই বৃত্তিমূলকশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা এবং গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সৃষ্টি

সমাজব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আধুনিকীকরণের ফলে দেশের যে সমৃদ্ধি ঘটবে তার জন্য ব্যক্তির জীবনে বহুমুখী চাহিদার সৃষ্টি হবে। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই ছাত্রের মধ্যে এইজাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

২। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।

৩। এই জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয়ের সময় পত্রিকায় পৃথক

ঘন্টা (period) নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে যারা এই কাজের উপযুক্ত তাঁরাই এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেবেন।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার (Comparative Religion) যে সব বিভাগ আছে তাদের উপর এই জাতীয় শিক্ষা সার্থক ও কার্যকরী-ভাবে দেবার উপায় নির্দ্ধারণ করার এবং এ বিষয়ে বিশেষ ধরণের সাহিত্য রচনার ভার দিতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্ম

ভারতবর্ষে বহুবিধ ধর্ম প্রচলিত আছে। সেইজন্য ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের মনোভাব, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হল ভারতের সমস্ত নাগরিক ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এদেশের প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব ধর্মচর্চ্চার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে কোন বিশেষ ধর্মমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা কিংবা ধর্মবিরোধীতা নয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

কমিশনের মতে ধর্মীয় শিক্ষা ও 'ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ ধর্মের মূলতত্ত্ব ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান আর ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার ধর্মের মূল বক্তব্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারে।

ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কমিশন বিভিন্ন ধর্মের সুনির্বাচিত তথ্যাদি নিয়ে একটি পাঠক্রম রচনা করার এবং বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রথম স্নাতক-স্তর পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য প্রত্যেক ধর্মের যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ও শিক্ষার মান

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো ও শিক্ষার মান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার পর কমিশন বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন।

বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপ

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৩) সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের দেশে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পবিকল্পনা করা হয় এবং বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয় এগার বছর। এর মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পাঁচ বছর, উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য তিন বছর এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য তিন বছর ধার্য্য করা হয়েছে। এগার বছরের বিদ্যালয় স্তরের পর প্রথম ডিগ্রীর জন্য তিন বছর ও দ্বিতীয় ডিগ্রীর জন্য আরও দু বছর সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। এইভাবে গত দশ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাংগঠনিক রূপের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সর্বত্রই তিন বছরের ডিগ্রী স্তর চালু হলেও কেবলমাত্র পাঁচটি রাজ্যে এগার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অন্যান্য রাজগুলিতে দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাই বজায় রাখা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ; যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠাগার ও বীক্ষণাগারের ব্যবস্থা নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের নানারকম বিভিন্নতা এখনও বর্তমান আছে।

প্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

অনুসন্ধানের ফলে কমিশন প্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির কথা জানতে পেরেছেন—

১। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নবম শ্রেণীতে অর্থাৎ ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে বিশেষধর্মী শিক্ষা শুরু করা হয়। কিন্তু দশম শ্রেণীর পর কিংবা ১৬ বছর বয়সে এই শিক্ষা শুরু করা উচিত।

২। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অপব্যয় ঘটে, কারণ পঞ্চম শ্রেণীর পর যে ছাত্র কোন কাজে বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যোগ দিতে পারত তাকে বাধ্য হয়ে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করতে হয়।

৩। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে শিক্ষার মানের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। এর কারণ হল বেতনের স্বল্পতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থান ও সাজসরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা।

৪। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে অহেতুক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ব্যয়বহুল ডিগ্রী কলেজে পরিণত করতে হয়েছে এবং সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টার ফলে নানাভাবে অহেতুক আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গ্রামাঞ্চলে যে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়টিতে পড়াশুনার মান উন্নত ছিল—সেটিকে একাদশ শ্রেণীতে পরিণত করায় একদিকে যেমন ব্যয় বেড়েছে আবার সেইসঙ্গে পড়াশুনার মানেরও অবনতি ঘটেছে।

কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা সংগঠনের নতুন পরিকল্পনা

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করে কমিশন যে নতুন শিক্ষা কাঠামোর পরিকল্পনা করেছেন সেটি নিম্নরূপ—

১। প্রাক-বিদ্যালয় স্তর—

এক বছর থেকে তিন বছরব্যাপী প্রি-বেসিক, কিণ্ডার গার্টেন, মন্তেসরি প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

২। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর—

(১ম শ্রেণী থেকে ৭ম বা ৮ম শ্রেণী)	সাত বা আট বছর ব্যাপী। এই স্তর দুভাগে বিভক্ত—(ক) চার কিংবা পাঁচ বছরের নিম্ন প্রাথমিক স্তর এবং (খ) তিন বছরের উচ্চতর প্রাথমিক স্তর।

৩। **নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয় স্তর—**

(৮ম শ্রেণী—১০ম শ্রেণী বা ৯ম শ্রেণী—১০ম শ্রেণী)	দুই বা তিন বছরব্যাপী সাধারণ শিক্ষা কিংবা এক থেকে তিন বছর ব্যাপী বৃত্তি-মূলক শিক্ষার স্তর।

৪। **উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর—**

(১১শ—১২শ শ্রেণী)	দু বছর ব্যাপী সারারণ শিক্ষা কিংবা এক থেকে তিন বছর ব্যাপী বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তর।

৫। **উচ্চতর শিক্ষার স্তর**—তিন বা তদূর্ধ বছরের প্রথম ডিগ্রী-স্তর এবংবিভিন্ন ধরণের স্থায়িত্বসম্পন্ন দ্বিতীয় ডিগ্রী বা গবেষণামূলক ডিগ্রীর স্তর।

কমিশনের মতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল প্রচলিত থাকবে। এর মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক তৃতীয়াংশ। বর্তমানে প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হলে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিন চতুর্থাংশ দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে; বাকী এক চতুর্থাংশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং এগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের স্বপারিশগুলি নিম্নরূপ—

১। প্রথম দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা হবে সাধারণধর্মী, এই পর্যায়ে কোন বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না।

২। যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের আগে এক থেকে তিন বছর ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বয়স সাধারণভাবে ৬ বছরের কম হবে না।

৪। প্রাথমিক স্তরের শেষে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ছাত্র সাধারণধর্মী শিক্ষা ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে; আরও ২০ ভাগ ছাত্র বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পাঠপ্রবাহে যোগদান করবে; অবশিষ্ট ৬০ ভাগ সাধারণধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে।

৫। দশ বছর ব্যাপী বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে একটি বহিঃস্থ পরীক্ষা (external examination) গ্রহণ করতে হবে।

৬। এই দশবছরব্যাপী শিক্ষার মান এই স্তরের জন্য নির্দ্ধারিত জাতীয় শিক্ষার মানের সমতুল্য হবে।

৭। দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র কর্ম-জীবনে প্রবেশ করবে; আরও ৩০ ভাগ বৃত্তিমূলক পাঠপ্রবাহে যোগদান করবে; অবশিষ্ট ৩০ ভাগ সাধারণধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। বর্ত্তমানে নবম শ্রেণী থেকে যে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিবর্ত্তে একাদশ শ্রেণী থেকে এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২। ইতিপূর্বে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাতিল করতে হবে। কমিশনের মতে ভারতবর্ষের মত গ্রামপ্রধান দেশে সমস্ত দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

৩। কমিশনের মতে সমগ্র দেশে দু-শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে—(ক) দশম-শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও (খ) দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কমিশন মনে করেন যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ হলেই তার দ্বারা সমস্ত অঞ্চলের চাহিদা মেটানো যাবে। তবে এইজাতীয় বিদ্যালয় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমানভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ও নিম্নমানসম্পন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেগুলিকে দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

৪। কমিশন একাদশ শ্রেণী থেকে বিশেষধর্মী শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছেন। দ্বাদশ শ্রেণী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেবল একাদশ শ্রেণীতেই এই শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষধর্মী শিক্ষা দেওয়া হবে।

৫। যতদিন সর্বত্র দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজে প্রবেশের জন্য প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে হবে। পরে সর্বত্র দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিলোপ ঘটবে।

৬। অন্তর্বর্ত্তীকালীন সময়ে ছাত্রদের একাদশ শ্রেণীর শেষে একটি ও দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে একটি এই দুটি বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা দিতে হবে। পরে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবর্ত্তন সম্পূর্ণ হলে শেষোক্ত পরীক্ষাটি দিলেই চলবে।

৭। বর্ত্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বহুমুখী পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে সেখানে যতদিন না দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবর্তন হচ্ছে ততদিন ঐ পাঠক্রম অনুসরণ করা চলবে। তবে এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর শেষে গৃহীত পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতা-মূলক হবে না।

প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরের স্থানান্তরকরণ

কমিশন প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরটিকে কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। কমিশনের মতে এই স্তরটিকে একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বর্ত্তমানে এটি একটি স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছে। সেইজন্য কমিশন আগামী পঞ্চ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগেই এই স্তরটিকে কলেজ থেকে অপসারণ করার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর মাধ্যমিক ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে এই কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের দায়িত্ব বহন করার জন্য অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আইনেরও সংশোধন করতে হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রলম্বীকরণ

কমিশন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের স্থায়িত্ব আরও এক বছর বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা একাদশ ও দ্বাদশ এই দু বছর ধরে চলবে। কমিশন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের স্থিতিকাল হবে দু বছর এবং এই স্তরটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।

২। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার আগামী ২০ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে (১৯৬৫—৮৫)।

৩। উপরোক্ত সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটিকে কলেজ থেকে সরিয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

৪। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই শিক্ষক-শিক্ষণের স্নাতকোত্তর স্তরটিকে দু বছর ব্যাপী করার চেষ্টা করতে হবে।

৫। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭১—৭২) শুরু থেকে ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তিকালের (১৯৮৫—৮৬) পূর্বেই তা শেষ করতে হবে।

৬। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষার স্থায়িত্ব হবে এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত। এই শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে ছেলেমেয়েদের চাকুরী লাভের সুবিধা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুনর্গঠন

স্বাধীনতালাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হল পূর্বে কলা ও বিজ্ঞানে প্রথম ডিগ্রীর স্তর ছিল দু বছরের ; বর্তমানে এই স্তর হয়েছে তিন বছরের। দ্বিতীয় ডিগ্রীর স্তরটি পূর্বের ন্যায় দু বছরেরই রাখা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভারতের সর্বত্রই এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন :

১। প্রথম ডিগ্রীর স্তর তিন বছরের কম হবে না। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার স্থিতিকাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রকার হতে পারে। দ্বিতীয় ডিগ্রীর স্থিতিকাল হবে ২ অথবা ৩ বছর।

২। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের এম. এ., এম.এস.সি., এম. কম ডিগ্রীর পাঠক্রম চালু করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিত ও সুদক্ষভাবে এই পাঠক্রম চালু করতে পারলে এর দ্বারা সুযোগ্য কর্মী সৃষ্টি করা যাবে।

৩। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য চার বছরের প্রথম ডিগ্রী স্তর চালু করা উচিত। চার বছরের ডিগ্রী স্তরের প্রথম বছর ও তিন

বছরের ডিগ্রী স্তরের প্রথম বছরের পাঠক্রম একই প্রকার হবে। প্রথম বছরের শেষে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আরও তিন বছর ব্যাপী বিশেষ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজের ও শিক্ষাদানের দিন ঃ—

কমিশনের মতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজের দিনের সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১৭২ থেকে ৩০৯ এবং কলেজের ক্ষেত্রে ১২০ থেকে ২৪০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ছুটির দিনের সংখ্যাও বিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৭৫ এবং কলেজে ৪ থেকে ৪৯ পর্যন্ত কমবেশী হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় হবে বছরে ২৩৪ দিন এবং কলেজে ২১৬ দিন।

২। বিদ্যালয়ে ছুটির দিন হবে নিম্নরূপ ঃ

১৫ই জুলাই ঃ স্কুল খোলার দিন
১৫ই জুলাই—৩০শে নভেম্বর ঃ প্রথম কর্ম-পর্যায়
১লা ডিসেম্বর—১৫ই ডিসেম্বর ঃ প্রথম ছুটি
১৬ই „ —৩১শে মে ঃ দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায়
১লা জুন—১৪ইজুলাই ঃ দ্বিতীয় ছুটি
নবম ও দশম শ্রেণীর সময় তালিকা পৃথক হবে।

৩। কলেজের ক্ষেত্রে—

১৫ই জুলাই – ৩০শে নভেম্বর ঃ প্রথম কর্ম-পর্যায়
১লা ডিসেম্বর—১৫ই ডিসেম্বর ঃ প্রথম ছুটি
১৬ই „ —৩০শে এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায়
১লা মে —১৪ই জুলাই ঃ দ্বিতীয় ছুটি

৪। দৈনন্দিন কাজের ঘন্টা সম্পর্কে কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

(ক) বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দৈনিক ৪ থেকে ৬ ঘন্টা
নিম্নপ্রাথমিক স্তরে বছরে ৯০০ ঘন্টা
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে ১০০০ ঘন্টা

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সপ্তাহে ৫০ থেকে ৬০ ঘন্টা। এর মধ্যে ১৫ থেকে

২০ ঘণ্টা শিক্ষকেরা শিক্ষাদান করবেন। বাকী সময় ব্যয়িত হবে স্বাধীনভাবে পড়াশুনায়।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা

কমিশনের মতে মান উন্নয়ন ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সুযোগ্য ব্যক্তিরা যাতে এই বৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী হন তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এরজন্য একদিকে যেমন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে অপর-দিকে তেমনি শিক্ষকদের কাজের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

শিক্ষকদের বেতন :—

স্বাধীনতার পূর্বে শিক্ষকদের বেতন ছিল খুবই সামান্য। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষকদের বেতন কিছুটা বৃদ্ধি হলেও তাকে খুব সন্তোষজনক বলা চলে না। কারণ বিগত কয়েক বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে সে তুলনায় এই বেতন বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হয়নি। তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনহারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই; এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতনহারের মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে। কমিশন অবিলম্বে এই বৈষম্যগুলি দূর করার জন্য সুপারিশ করেছেন। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

শিক্ষকের শ্রেণী	নিম্নতম বেতন	কুড়ি বছরে বর্ধিত হবে	বিশেষ নির্বাচিত (মোট সংখ্যার ১৫%)
১। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক, দু-বছরের পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১৫০৲	২৫০৲	২৫০-৩০০
২। এক বছরের পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষক	২২০৲	৪০০৲	৩০০-৫০০
৩। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৩০০-৬০০	—	—
৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	বিদ্যালয়ের মান ও যোগ্যতা অনুযায়ী কলেজ স্তরের নিম্নলিখিত বেতনহারের যে কোন একটি পাবেন।		

৫। কলেজের অধ্যাপক :

লেকচারার-জুনিয়র স্কেল :	৩০০৲	— ২৫৲	—	৬০০৲
সিনিয়র স্কেল :	৪০০৲	— ৩০৲		৬৪০৲-৪০৲-৮০০৲
সিনিয়র লেকচারার রিডার :	৭০০৲	— ৪০৲	—	১১০০৲
কলেজ অধ্যক্ষ ১।	৭০০৲	— ৪০৲	—	১১০০৲
২।	৮০০৲	— ৫০৲	—	১২৫০৲
৩।	১০০০৲	— ৫০৲	—	১৫০০৲

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক :

লেকচারার : ৪০০৲—৪০৲—৮০০৲—৫০৲—৯০০৲

রিডার : ৭০০৲—৫০৲—১২৫০৲

প্রফেসর : ১১০০৲—৫০৲—১৩০০৲—৬০৲—১৬০০৲

সিনিয়র প্রফেসর : ১৬০০৲—১৮০০৲

(মোট সংখ্যার ⅓ অংশ)

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও উচ্চহারের বেতন দেওয়া যেতে পারে।

		৫ বছর পর
৭। (ক) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক	১০০৲	১২৫৲
(খ) দু বছরের শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক	১২৫৲	১৫০৲

অবসর গ্রহণ কালীন সুবিধাদি

১। বিদ্যালয় স্তরে

কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স বিভিন্ন প্রকার। কমিশনের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স হওয়া উচিত ৬০ বছর। অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকলে অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলবে।

বিভিন্ন রাজ্যে অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকেরা যে সুযোগ সুবিধা পান তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পেনসন,

গ্রাচুইটি ও পরিবারবর্গের পেনসনের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ছাড়া অন্য কোন সুবিধা পান না। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রিপল-বেনিফিট পরিকল্পনা (Triple-Benefit Scheme) গ্রহণ করেছেন। কমিশন সমস্ত রাজ্যের বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য এই পরিকল্পনাটি চালু করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া বর্তমানে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের প্রচলিত সুদের হার (৪%) যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন।

২। কলেজ স্তরে

কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স সাধারণত ৬০ বছর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই বয়স ৬৫ বছর পর্য্যন্ত বাড়ান হয়, অনেক ক্ষেত্রে ৭০ বছর পর্যন্তও বাড়ান হয়। প্রায় সমস্ত কলেজেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং চাঁদার হার সাধারণত ৮⅓%। কমিশন কলেজের ক্ষেত্রেও টিপল-বেনিফিট পরিকল্পনাটি চালু করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া কমিশন সাধারণভাবে শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত ও অন্যান্য নিয়মাবলীর সংস্কার করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কমিশন শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন কমিশন তাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং এই পুরস্কারের সংখ্যা আরও বাড়াবার জন্য সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ

স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫৩) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পাঠক্রমের উপর নিযুক্ত আন্তর্জাতিক দল (১৯৫৪)—প্রত্যেকেই প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান সুপারিশগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা-প্রবাহ এবং বিদ্যালয়গুলির দৈনন্দিন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান হয় মাঝারি কিংবা খুব নীচু ধরণের। এইসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং এখানে বাস্তবতাবর্জিত পাঠক্রম ও গতানুগতিক কার্যসূচী অনুসরণ করা হয়। এইজন্য কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ

কমিশনের মতে বর্ত্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন তিন প্রকার বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা; (২) বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা ও (৩) বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা।

১। বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিতান্ত অবহেলিত।

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিশন 'শিক্ষা'কে সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতিদানের জন্য সুপারিশ করেছেন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে "শিক্ষাবিজ্ঞান" কে একটি নির্বাচনীয় বিষয় হিসাবে (elective subject) চালু করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানে দু বছরের এম. এ. ডিগ্রীর প্রবর্ত্তন করতে হবে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই শিক্ষাদানের অনুশীলন (Practice teaching) বাধ্যতামূলক করতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে হলে পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা এবং উন্নত শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি সম্প্রসারিত বিভাগ (Extension Department) থাকবে। এই বিভাগের কাজকর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে এই বিভাগের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি করে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংঘ গড়ে তুলতে হবে। মাঝে মাঝে এই সংঘের সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া সাধারণভাবে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা দূর করার আর একটি পন্থা হল প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের কোন বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করার ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান। এর জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন কতকগুলি বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা এই কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এই জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে একই সঙ্গে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলে কমিশন বর্তমানে তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন—

(ক) কমপ্রিহেনসিভ কলেজ স্থাপন—এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করতে হবে।

(গ) ষ্টেট বোর্ড অব টিচার্স এডুকেশন (State Board of Teachers' Education) স্থাপন—এই বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষাবিভাগের অধীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

শিক্ষক শিক্ষার মানের উন্নয়ন

কমিশনের মতে শিক্ষক শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। এই উন্নতির জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলি হল বিষয়-জ্ঞানের পুনর্বিন্যাস, বৃত্তিমূলক পাঠের উন্নয়ন, শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন, শিক্ষার্থী শিক্ষার উন্নয়ন, বিশেষ পাঠস্তর ও কার্যসূচীর উন্নয়ন এবং পাঠক্রমের সংস্কার

সাধন। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থায়িত্ব হবে দু বছর। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থায়িত্বও দু-বছর হওয়া উচিত, তবে অর্থনৈতিক কারণে যতদিন তা সম্ভব না হয় ততদিন শিক্ষা বৎসরের কাজের দিন ১৮০—১৯০ থেকে বাড়িয়ে ২৩০ করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষার পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করার চেষ্টা করতে হবে। ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে শিক্ষক-শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায় তারজন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও আলোচনার অধিকতর সুযোগ দিতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দ্বারা শিক্ষণ অনুশীলন (Practice teaching) এবং তথ্যমূলক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষার নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ডেমনস্ট্রেশন স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম ও কর্মসূচী নতুন ক'রে প্রনয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও শিক্ষা-বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ:

১। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকবে—একটি সাধারণ বিষয়ে আরেকটি শিক্ষা বিজ্ঞানে। এ ছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষকের ডক্টরেট ডিগ্রী থাকবে।

২। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করতে হবে।

৩। অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির স্থাপন করতে হবে।

৪। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের বি, এড়,

ডিগ্রী সহ হয় শিক্ষাবিজ্ঞানে না হয় কোন একটি সাধারণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকবে।

৫। দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাউকে প্রাথমিক শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা চলবে না।

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের ডাকযোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পড়াশুনা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

৭। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্ব সর্বত্র দু বছর করতে হবে।

৮। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হবে না। তাছাড়া তাদের বৃত্তি ও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একটি করে ডেমনস্ট্রেশন স্কুল থাকবে।

১০। শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। পাঠাগার, গবেষনাগার প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সুবিধার প্রসার

১। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে।

২। আংশিক সময়ের জন্য এবং ডাকযোগে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৩। শিক্ষণহীন শিক্ষকদের যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হবে।

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতির প্রতি কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সদ্য-নিযুক্ত শিক্ষকেরা যাতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নিতে পারেন তার জন্য তাদের সময় দেওয়া উচিত। এই সব শিক্ষকেরা যাতে প্রখ্যাত শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের জন্য কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষার মান

ইউ, জি, সি কে (U. G. C) শিক্ষক-শিক্ষার উপযুক্ত মান সংরক্ষণের

দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ষ্টেট বোর্ড অব টিচার এডুকেশন। শিক্ষক-শিক্ষার উন্নতির জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইউ. জি. সির হাতে যথেষ্ট পরিমান অর্থ দিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাদানের নীতি

ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজব্যবস্থা গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে গণশিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে। কমিশ জাতীয় শিক্ষাদানের নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্দ্ধারণ করেছেন ঃ

১। প্রত্যেক শিশুকে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে এবং নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ও যোগ্য ব্যক্তিদের উক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদা এবং উপযুক্ত মান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব আছে তাদের পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

৩। পেশাগত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য সুদক্ষ কর্মী তৈরী করতে হবে।

৪। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাহায্য করতে হবে।

৫। নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৬। সকলের জন্য সমান শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে যে সব মারাত্মক বৈষম্য আছে সেগুলি দূর করতে হবে।

সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন

কমিশনের মতে সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ২০ বছর ঐ কর্মসূচীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ ;

১। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ৫ বছর ব্যাপী কার্যকরী শিক্ষা দিতে হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাপী করতে হবে।

২। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের যে সব ছেলেমেয়ে নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেনি এবং যারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্য ১ বছর ব্যাপী আংশিক সময়ের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের নীতি

কমিশনের মতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের নীতি চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে—(১) এই জাতীয় শিক্ষার জন্য জনসাধারণের চাহিদা; (২) জন্মগত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ; (৩) নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগদানে সমাজের সামর্থ্য এবং (৪) জাতীয় অগ্রগতির জন্য মানবশক্তির চাহিদা।

বর্তমানে জনসাধাণের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা যে পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় শিক্ষার সুযোগ মোটেই পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু যেহেতু পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন সেইজন্য বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কমিশনের মতে মানবশক্তির চাহিদা ও চাকুরির সুযোগ যে হারে বৃদ্ধি পাবে শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধারও সেই অনুযায়ী প্রসার ঘটাতে হবে। মানবশক্তির চাহিদা কি পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে আধুনিক পন্থায় তার পরিমাপ করতে হবে। তা ছাড়া উন্নতমানের মানবশক্তি সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিক্ষিত মানবশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদা

কমিশন মানবশক্তির চাহিদার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখন ভবিষ্যতে শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদা কিরূপ হবে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কমিশন ইনষ্টিটিউট অব এ্যাপ্লায়েড ম্যানপাওয়ার রিসার্চ-এর ব্যাপক

অনুসন্ধান এবং নিউ দিল্লীর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্ল্যানিং ইউনিট ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের যৌথ অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যাদির উপর নির্ভর করতে বলেছেন। শেষোক্ত পরিসংখ্যানটিকে ISI/LSE পরিসংখ্যান বলা যেতে পারে। এই পরিসংখ্যানে আগামী ২০ বছরের জন্য যে শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদার পরিমাপ দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যব করতে হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করতে হবে :—

১। শিক্ষিত বেকারের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রসার রোধ করতে হবে।

২। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিধর্মী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পেশাগত শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে।

৩। মানবশক্তির চাহিদার সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যাতে সামঞ্জস্য-পূর্ণ হয় তার জন্য শিক্ষার পরিকল্পনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করতে হবে।

মানবশক্তির চাহিদা নিরুপন করার দায়িত্ব প্ল্যানিং কমিশনকে (Planning Commisson) গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও বিভিন্ন রাজ্যে ষ্টেট কমিটি (State Committee) গঠন করতে হবে।

শিক্ষামূলক সুযোগের সমানাধিকার

সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে শিক্ষামূলক সুযোগসুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারে তারজন্য কমিশন সকল স্তরের শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অবৈতনিক করে তোলার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। এর পরবর্তী দশ বছরে উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক করতে হবে। প্রথমে এই স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ যাতে এই অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য ব্যয়—বেতন ছাড়াও শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়ের ব্যাপারে

কমিশন ছাত্রছাত্রীদের নিম্নরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে বুক ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে এবং পাঠাগারের উন্নতি করতে হবে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে হবে।

ছাত্রবৃত্তি—বর্তমানে ছাত্রবৃত্তিদানের যে ব্যবস্থা আছে তার আমূল সংস্কার করতে হবে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষে অর্থাভাবে যাতে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রছাত্রীর শতকরা ২.৫ ভাগ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫ ভাগ ছাত্রের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ১৯৭৬ সালের মধ্যে মোট স্নাতক শিক্ষার্থীর শতকরা ১৫ ভাগ এবং ১৯৮৬ সালের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করতে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে ১৯৭৬ সালের মধ্যে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ২৫ ভাগ ও ১৯৮৬ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশন জাতীয় ছাত্রবৃত্তি দানের পরিকল্পনাটিকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। জাতীয় ছাত্রবৃত্তিদানের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হবে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষায় উচ্চ স্থানাধিকারী শতকরা ৫ ভাগ শিক্ষার্থীকে জাতীয় ছাত্রবৃত্তি দেওয়া এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার্থী যাতে ঐ বৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা করা। এইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তিদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং ইউ-জি-সির মাধ্যমে এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

এ ছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তি ও বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রতিভাবান ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন ঋণমূলক ছাত্রবৃত্তি দেবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যও সুপারিশ করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারের সমস্যা

কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তরটিকে একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন স্তর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই স্তরের বিভিন্ন বিভাগগুলি হল প্রাক-প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন ও উচ্চমাধ্যমিক

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর।

আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যাতে যথেষ্ট প্রসার ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৩ থেকে ৫ বছর বয়স গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শতকরা ৫ ভাগ এবং ৫ থেকে ৬ বছর বয়স গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শতকরা ৫০ ভাগ যাতে এই শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব বিদ্যালয় প্রধানত বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হবে। তবে রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

দায়িত্বশীল ও উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করাই হবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার

১। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুকে ৫ বছর ব্যাপী কার্যকরী ও উৎকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা দিতে হবে।

২। ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাপী করার চেষ্টা করতে হবে।

৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় যাতে কমে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যেন সাত বছরে সপ্তম শ্রেণীতে পৌঁছায়।

৪। সপ্তম শ্রেণীর শেষে কোন শিক্ষার্থীর বয়স যদি ১৪ বছরের কম হয় এবং সে যদি আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে না চায় তাহলে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে বিদ্যালয়ে কোন প্রকারের বৃত্তিধর্মী কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার

কমিশনের মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিশুর বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। প্রথম শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি না করে কেবলমাত্র ৫-৬ বা ৬-৭ বয়োগোষ্ঠীর ছাত্রদের ভর্তি করতে হবে।

২। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শতকরা ১০০ জন ছাত্রছাত্রীই যাতে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে উন্নীত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথম শ্রেণীতে বর্তমানে যে অত্যাধিক অপচয় ঘটে তা দূর করার জন্য কমিশন নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেছেন :

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি সুসংহত একক হিসাবে গণ্য করতে হবে।

২। এক বছরের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা চালু করতে হবে।

৩। প্রথম শ্রেণীতে খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য শ্রেণীতে অপচয় দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আংশিক সময়ের শিক্ষা, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারনের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। আগমী কুড়ি বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে হবে।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। যোগ্যতম শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করতে হবে।

৫। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে এবং দশ বছরের মধ্যে তা কার্যকরী করতে হবে। প্রতিটি

নতুন বিদ্যালয়ের মান যেন উন্নত হয় এবং প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি যেন তাদের মান উন্নয়ন করার চেষ্টা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের রেকর্ডের ভিত্তিতে যাতে যোগ্যতম শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিধর্মিকরণ

মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিক মাত্রায় বৃত্তিধর্মী করার চেষ্টা করতে হবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রাছাত্রীর শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। এই উভয় স্তরেই আংশিক ও পূর্ণ সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাজ্যসরকার গুলিকে অর্থসাহায্য করবেন।

মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা

মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য কমিশন নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করেছেন:

১। কুড়ি বছরের মধ্যে যাতে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে ও ছেলেদের অনুপাত ১ : ২ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ১ : ৩ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন, হোষ্টেল ও ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা, আংশিক সময়ের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয় পাঠক্রম (School Curriculum)

সাম্প্রতিক কালে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে প্রচলিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের আমূল সংস্কার সাধনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কমিশন পাঠক্রমের সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন:

১। পাঠক্রমের উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ ও ষ্টেট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনকে গবেষণা চালাতে হবে। এই গবেষণার ভিত্তিতে মাঝে মাঝে পাঠক্রমের সংস্কার করতে হবে। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী যাতে তারা নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩। বিদ্যালয় শিক্ষার ষ্টেট বোর্ডগুলিকে (State Boards of Education) প্রত্যেক বিষয়ের সাধারণ ও উন্নত ধরণের পাঠক্রম রচনা করতে হবে এবং সেগুলিকে বিদ্যালয়ে চালু করতে হবে।

৪। পাঠক্রম সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার ও পাঠক্রমের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি ক'রে বিষয় শিক্ষক সংস্থা (Subject Teachers' Association) গঠন করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

কমিশন বিদ্যালয় স্তরে একটি নতুন ভাষানীতি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। কমিশনের মতে এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করতে হবে :

(ক) সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর স্থান হবে মাতৃভাষার পরেই।

(খ) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইংরাজী ভাষায় কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(গ) ভাষাশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য সুযোগ্য শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) তিনটি ভাষাশিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় হল নিম্নমাধ্যমিক স্তর (অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী)।

(ঙ) দুটি অতিরিক্ত ভাষা চালু করার সময় পিছিয়ে দিতে হবে।

(চ) প্রেষণা (motivation) এবং চাহিদা (need) যখন সবচেয়ে বেশী হবে তখন হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) কোন স্তরেই চারটি ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

কমিশন যে ত্রি-ভাষা নীতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

(ক) মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা কিংবা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা।

(গ) 'ক' ও 'খ' তে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা কিংবা ইউরোপীয় ভাষা।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা হয় মাতৃভাষা না হয় একটি আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা করবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তারা মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা (অথবা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা)—এই দুটি ভাষা শিখবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষা হবে তিনটি—মাতৃভাষা (বা আঞ্চলিক ভাষা) (২) রাষ্ট্রভাষা (বা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা) এবং (৩) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কেবল দুটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য আধুনিক পাঠাগার ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এইসব ভাষা হিন্দী অথবা ইংরাজীর পরিবর্তে শেখা যাবে। অনুরূপভাবে অহিন্দীভাষী অঞ্চলে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে হিন্দী বা ইংরাজীর পরিবর্তে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারী ও সহযোগী সরকারী ভাষা শিক্ষার জন্য একটি তিন-বছরের ও অপরটি ছ' বছরের এই দুটি পর্যায় থাকবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে না। হিন্দী শিক্ষার জন্য সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। তবে জোর করে এই ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা চলবে না। পঞ্চম শ্রেণীর পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত বা আরবী অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক ভাষা রূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুটি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু আর কোন নতুন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না।

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে জ্ঞানার্জন ও যুক্তিধর্মী চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্তরে আরও উন্নত বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শহরাঞ্চলে কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হবে।

গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং গণিতের পাঠক্রমকে যথাসম্ভব আধুনিক করতে হবে।

বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষণ পদ্ধতিরও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে

মৌলিক নীতির উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ, বীক্ষণাগারের কাজের উন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদার পরিতৃপ্তির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমাজবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান :

সুনাগরিকত্ব ও প্রক্ষোভমূলক সংহতির (emotioal integration) বিকাশ সাধনের জন্য সমাজবিদ্যার একটি কার্যকরী কর্মসূচী রচনা করতে হবে। এর জন্য পাঠক্রমে জাতীয় ঐক্য এবং মানব সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

কর্ম-অভিজ্ঞতা :

নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ম-অভিজ্ঞতাকে পরিচালিত করতে হবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে সাধারণ হাতের কাজ এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ক্রাফট বা শিল্প হবে কর্ম-অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ওয়ার্কশপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে স্কুল-ওয়ার্কশপ, ফার্ম, বাণিজ্যিকও শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ছাত্রদের কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষকদেরও উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

সমাজ সেবা :

প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজ সেবা এবং গ্রাম ও সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবে। সারা বছর ধরে শ্রম-শিবির ও সমাজ সেবার শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শারীর শিক্ষা :

শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক তৎপরতা ও বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ হয়। বর্তমানে শারীর শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাকে শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে আরও উন্নত করতে হবে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা :

বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান প্রধান ধর্মের নৈতিক শিক্ষাকে ভিত্তি করে এই শিক্ষা দেবার আয়োজন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় এই জাতীয়

শিক্ষার জন্য সপ্তাহে একটি কিংবা দুটি পিরিয়ড নির্দ্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং এই শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমের মধ্যে পার্থক্য ঃ

কমিশনের মতে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হবে না। মেয়েরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গৃহ বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে, কিন্তু একে বাধ্যতামূলক করা চলবে না। মেয়েদের জন্য ব্যাপকভাবে সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে।

শিক্ষণ পদ্ধতি, নির্দেশনা ও মুল্যায়ন ঃ

কমিশন শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির প্রভূত সংস্কার সাধন ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও নমনীয়তা আনবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ দান করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার মানকে উন্নত করতে হলে স্বল্পমূল্যে ছাত্রেরা যাতে উন্নতধরণের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতমানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের শিক্ষাবিভাগকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার মান শ্রেণী সংগঠনের আকৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। সেইজন্য কমিশন শিক্ষার্থীর সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ৫০, উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৪৫ এবং উচ্চতর মাধ্যামিক স্তরে ৪০ করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

কমিশন সুপরিচালনা ও সুনির্দেশনার উপর ও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগতি অনেকাংশে সুপরিচালনার উপর নির্ভর করে। কাজেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুপরিকল্পিত ও মনো-বিজ্ঞান-ভিত্তিক সুপরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিক্ষার্থীর পড়াশুনা ও শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর মূল্যায়ন যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যায়ন একদিকে যেমন শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ করে অন্য দিকে তেমনি শিক্ষার উন্নতিতেও বিশেষ সহায়তা করে থাকে। সুতরাং মূল্যায়নের প্রচলিত

পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, বহিঃস্থ পরীক্ষা, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative record card) প্রভৃতির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বিস্তালয় শিক্ষার পরিশাসন ও তত্ত্বাবধান (School Education : Administration and Supervision)

কমিশনের মতে শিক্ষামূলক সংস্কারকে তরান্বিত করতে হলে বিস্তালয়ের পরিশাসন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে।

কমিশন যে সাধারণ বিস্তালয় (Common School) প্রথা চালু করার কথা বলেছেন সেখানে বিভিন্ন প্রকার বিস্তালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে নানারূপ বৈষম্য আছে তা দূর করতে হবে। সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার বিস্তালয়ের মধ্যে যেসব বৈষম্য আছে সেগুলিও দূর করতে হবে। প্রত্যেক বিস্তালয়ের পরিচালক সমিতিতে পরিচালকদের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। যে সব বিস্তালয়ের শিক্ষার মান খুব নীচু সেগুলি পরিচালনার ভার যাতে শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এড সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করতে হবে। বিস্তালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য জাতীয়-ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

বিস্তালয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের উপর। শিক্ষা দপ্তর বিস্তালয়ে শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট মান বজায় রাখা, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিস্তালয়ের কাজকর্ম নিয়মিত পরিদর্শন করা প্রভৃতি ব্যবস্থা করবেন।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য

বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষার লক্ষ্য :

কমিশনের মতে বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ :

(ক) নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধানও তার অনুশীলন। সত্যের নির্ভীক অনুসরণ এবং নতুন নতুন চাহিদা ও আবিষ্কারের আলোকে পুরাতন জ্ঞানের সংব্যাখ্যান।

(খ) জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত নেতৃত্বদান, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধান এবং তাদের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।

(গ) সমাজকে কৃষি, কলা, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরি ও অন্যান্য বৃত্তির ক্ষেত্রে সুযোগ্য নারী ও পুরুষ সরবরাহ করা।

(ঘ) সাম্য ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর করা।

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যাতে তাদের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর জীবনের বিকাশ ঘটে।

মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয় (Major University)

কমিশন কতকগুলি উন্নত ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছেন। এগুলিকে মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে খুবই উন্নত ধরনের কাজকর্ম ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে এবং এগুলি পৃথিবীর যে কোন উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হবে। ইউ. জি.সি. যে কোন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়রূপে নির্বাচিত করবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য কিছু সংখ্যক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যক বিভাগে বা ফ্যাকাল্টিতে একটি করে উপদেষ্টা সমিতি থাকবে। এই সমিতির কাজ হবে উপযুক্ত কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।

মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কতকগুলি উন্নত শিক্ষালাভের কেন্দ্র থাকবে। এই কেন্দ্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন গবেষণায় সহায়তা করবে। আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এইরূপ পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এইসব কেন্দ্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন :

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলিতে সুযোগ্য শিক্ষক সরববাহের দায়িত্ব মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিতে হবে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা যাতে বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। ইউ, জি, সি,-কে লেকচারার, রিডার ও প্রফেসরদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলি শিক্ষক নিয়োগ করার পর তাদের কিছুদিনের জন্য মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পাঠাবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজের সম্ভাবনাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানীদের কিছুদিনের জন্য কোন উন্নত শিক্ষা কেন্দ্রে গবেষণা ও আলোচনা সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যম :

কমিশন আগামী দশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

প্রথমে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরাজীর মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া হবে। ক্রমশঃ উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত সকল শিক্ষককেই দ্বিভাষাভাষী হতে হবে এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরাজী—এই দুটি ভাষাতেই বক্তৃতা বুঝতে ও বই পড়তে সক্ষম হবে।

অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী-মাধ্যম কলেজ এবং দেশের যে-কোন অংশে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক উর্দু-ভাষী ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে উর্দু মাধ্যম কলেজ স্থাপনের অনুমতি ও উৎসাহ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে না, ঐচ্ছিক বিষয়রূপে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য পাঠাগার ভাষা (বিশেষ ক'রে রাশিয়ান ভাষা) ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

নির্বাচনভিত্তিক ভর্তির ব্যবস্থা

মানবশক্তির চাহিদা এবং চাকুরীর সুযোগ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যেহেতু উচ্চশিক্ষার সুযোগ অপেক্ষা তার চাহিদা অনেক বেশী সেইজন্য নির্বাচনের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

১। প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অনুযায়ী তার আসন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করতে হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করতে হবে।

৩। যোগ্য ও ভর্তি হতে ইচ্ছুক এমন ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের বেছে নিতে হবে।

৪। ভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেবার জন্য বোর্ড অব ইউনিভারসিটি অ্যাডমিশন গঠন করতে হবে।

৫। উপযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি সেন্ট্রাল টেসটিং অর্গানাইজেশন (Central Testing Organisation) গঠন করবেন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশন কতকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। কমিশনের মতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যে বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে দুটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কেরালা ও উড়িষ্যা রাজ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী যুক্তিসঙ্গত। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

বয়স্কদের শিক্ষা (Adult Education)

কমিশন যথাসম্ভব শীঘ্র দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের মতে জাতীয় স্বাক্ষরতার হার ১৯৭১ সালের মধ্যে শতকরা ৬০ ও ১৯৭৬ সালের মধ্যে শতকরা ৮০ তে উন্নীত করতে হবে। এর জন্য যেমন ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয় খণ্ড

[এই অংশে কমিশন তাঁদের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা ও কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা-প্রশাসন ও অর্থ-সংস্থান এই দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ।]

শিক্ষা-প্রশাসন (Edncational Adiministration)

কমিশনের মতে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রশাসনের দায়িত্ব প্রধানত রাজ্যসরকার ও স্থানীয় অধিবাসীদের যৌথভাবে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে .এই দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার যৌথভাবে গ্রহণ করবেন। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে পঞ্চায়েৎ ও মিউনিসিপ্যালিটি এবং সরকার এদের অর্থসাহায্য দেবেন। সরকারী সাহায্যের দ্বারা বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় (শিক্ষক-বেতন ইত্যাদি) নির্বাহ হবে, আর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য স্থানীয় অর্থ ব্যয়িত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সকল স্তরের শিক্ষা-প্রশাসনের ভার থাকবে জেলা স্কুল বোর্ডের উপর। বিদ্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষামানের উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসন এই দুটি বিষয় তদারকি করার জন্য দুই রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হবে।

কমিশনের মতে রাজ্যস্তরে প্রশাসনের দায়িত্ব থাকবে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মূল্যায়ন-সংস্থা (Evaluations Organisation) ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন, শিক্ষক-শিক্ষণ কাউন্সিল ও রাজ্য শিক্ষা-পরিষদের উপর। সংবিধান অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ও উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, আর অন্য সকল স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কমিশন উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্ত্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।

অর্থ-সংস্থান (Finance)

শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী ২০ বছরে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমান মাথা পিছু ১২ টাকা (১৯৬৫-৬৬) থেকে বৃদ্ধি করে ৫৪ টাকা করতে হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী দশ বছরে (১৯৬৫-৭৫) অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এই অর্থ শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সংযুক্তি, শিশুদের জন্য অন্ততঃ পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিধর্মী করার কাজে ব্যয়িত হবে। পরবর্তী দশ বছরে (১৯৭৫-৮৫) সাত বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। ১৯৮৫ সালের পর উচ্চশিক্ষা ও গবেষনার উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য অর্থব্যয়ের দায়িত্ব প্রধানত সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকেও যাতে এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

সমালোচনা :—

শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনই ভারতে সর্বপ্রথম কমিশন যার কর্মপরিধি পূর্ববর্তী যে কোন কমিশনের কর্মপরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। ভারতীয় শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের নানাবিধ সমস্যার পর্যালোচনা ও সেগুলির সমাধানের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট সুপারিশ এই কমিশনের সুবৃহৎ রিপোর্টে স্থানলাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি যে শিক্ষা কমিশনগুলি নিযুক্ত হয়েছিল সেগুলি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ স্তরের সমস্যাদি ও তার সমাধান সম্পর্কে নানাবিধ গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করেছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উপযুক্ত পারম্পর্য বজায় রেখে সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক সংস্কার করার জন্য এই জাতীয় একটি শিক্ষা কমিশনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই-দিক থেকে বিচার করলে স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কোঠারি কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষার যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা। ইতিপূর্বে এই স্তরের শিক্ষার গুরুত্ব এবং এর উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন-রূপ চিন্তা করা হয়নি। কমিশন এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর ফলে এতদিন প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যে অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছে তা অনেক পরিমাণে দূর হবে।

কিন্তু এই স্তরের শিক্ষার যথাযথ উন্নয়নের জন্য যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করা উচিত ছিল কমিশন সে সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এই স্তরের শিক্ষা যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং এর জন্য সুযোগ্য শিক্ষক ও নানাবিধ সরঞ্জামের প্রয়োজন। কমিশন এই শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানত বেসরকারী উদ্যোক্তাদের হাতে অর্পণ করায় এর ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে গেছে। বেসরকারী উদ্যোগ সুপরিকল্পিতভাবে কখনই সারা দেশে এই জাতীয় শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও এই স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার ব্যাপারে কমিশন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। ভারতীয় সংবিধানে দশ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তারপর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কমিশন এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশন ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত (১১+) এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে সপ্তম শ্রেণী (১৩+) পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কমিশনের এই নির্দেশ কোনদিক দিয়েই দেশের অগ্রগতির সহায়ক হবে বলে মনে হয় না; উপরন্তু এটি দেশের পশ্চাৎপদতাকে জীইয়ে রাখতে সহায়তা করবে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টের প্রথম অংশে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে কমিশনের এই জাতীয় সুপারিশের সঙ্গতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্ত্তনকে তরান্বিত করার ব্যাপারে কমিশনের আরও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্ত্তন করার ব্যাপারে কমিশনের নির্দ্দেশগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৩) সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং বিগত দশ বছর ধরে প্রচুর সংখ্যক এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কোঠারি কমিশন বর্ত্তমানে প্রচলিত এই একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর আমূল সংস্কার করার সুপারিশ করেছেন। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের স্থায়িত্ব আরও এক বছর বাড়াতে হবে এবং পাঠক্রমের বহুমুখিতা (diversification) শুরু হবে নবম শ্রেণীর পরিবর্ত্তে একাদশ

শ্রেণী থেকে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে একই পাঠক্রম অনুসরণ করতে হবে।

বর্তমানে, প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী বিদ্যালয়গুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব এক বছর বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করেছিলেন কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক বছর যোগ করার পরও মাধ্যমিক শিক্ষার মানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। সেইজন্য অনেক শিক্ষাবিদ মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব আরও এক বছর বৃদ্ধি করে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। কমিশন এই শেষোক্ত পরিকল্পনাটিকেই অধিকতর ফলপ্রসূ বলে মনে করেছেন। কমিশন প্রদত্ত দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে।

এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো যেতে পারে সেগুলি হল—(১) এই পরিকল্পনায় সমস্ত দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীরবিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে না। ফলে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে; (২) ইতিপূর্বে সমস্ত দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার ফলে বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত স্থান, উন্নত সাজসরঞ্জাম, গবেষনাগার, সুযোগ্য শিক্ষক প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; কমিশন প্রদত্ত পরিকল্পনায় এইসব সমস্যার তীব্রতা অনেক কমে যাবে; (৩) যে সব সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চায় না তারা দশ বছর ব্যাপী বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে, ফলে প্রভূত অর্থ ও মানসিক ব্যক্তির অপচয় বন্ধ হবে।

দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রবর্তন করার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো যেতে পারে—(১) কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যার ২৫% দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে একাদশ শ্রেণীর অনেক বিদ্যালয়কে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অবনমিত করতে হবে এবং এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটবে। এইসব বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠক্রম অনুযায়ী যে সব উন্নত ও ব্যয়বহুল সাজসরঞ্জাম কেনা হয়েছে, যে সব বিষয়-

শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে, যে সব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে সে সবের সদ্ব্যবহার করা যায় কিনা কিংবা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ আলোচনা করেন নি। (২) কমিশন কতকগুলি সুনির্বাচিত বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই নির্বাচন প্রধানত বিদ্যালয়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে। ফলে এই জাতীয় অধিকাংশ বিদ্যালয় স্থাপিত হবে প্রধানত শহরাঞ্চলে। এতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ সুবিধার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্যের সৃষ্টি হবে এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষার সংকোচন ঘটবে; (৩) যে সব রাজ্যে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি বা আংশিকভাবে করা হয়েছে সেখানে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা বিশেষ অসুবিধাজনক না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে ইতিমধ্যেই মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০% একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে সেখানে কমিশনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে প্রচুর সংখ্যক একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে অবনমিত করতে হবে। এর ফলে যেসব জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে তা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক শিক্ষাবিদের মতে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু হলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া যাবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়া যাবে না। সেইজন্য অনেকে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়, দু বছরের ইণ্টারমিডিয়েট ও দু বছরের ডিগ্রি ক্লাসের পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী।

কমিশন নবম শ্রেণীর পরিবর্ত্তে একাদশ শ্রেণী থেকে যে পাঠক্রমের বহুমুখী-করণের নির্দেশ দিয়েছেন তা অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে খুবই যুক্তিযুক্ত। কারণ তাঁদের মতে নবম শ্রেণীর সূচনায় শিক্ষার্থীদের বয়স থাকে মাত্র ১৪+বা ১৫+—এই বয়সে তাদের মানসিক শক্তি কোন বিশেষধর্মী পাঠক্রম গ্রহণ করার মত পরিপক্কতা লাভ করে না। কাজেই কমিশন একাদশ শ্রেণী থেকে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার নির্দ্দেশ দিয়ে যথেষ্ঠ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী —দু বছর ছাত্রেরা বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করবে। বর্ত্তমানে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী—এই তিন বছর ছাত্রদের বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কাজেই কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষধর্মী শিক্ষার স্থায়িত্ব এক বছর

কমে যাবে। এর ফলে বিশেষধর্মী শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে কিনা সে সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ আছে।

কমিশন দ্বাদশশ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তাতে প্রথম ডিগ্রীস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকালের স্থায়িত্ব দাঁড়াচ্ছে ১৫ বছর। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে প্রভৃতি রাজ্যে এই শিক্ষাকালের স্থায়িত্ব হল ১৪ বছর। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে অবশ্য এই শিক্ষাকালের স্থায়িত্ব ১৫ বছরই আছে। যে সব রাজ্যে এই শিক্ষাকাল এক বছর বৃদ্ধি করা হবে সেখানে একদিকে যেমন শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি অভিভাবকদেরও আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আরও এক বছর দেরী হবে। আমাদের দেশে যেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অধিকাংশ খরচ অভিভাবকদের বহন করতে হয় এবং অধিকাংশ অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতির যথেষ্ট অভাব আছে, সেখানে অভিভাবকদের উপর আরও অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষাসংকোচনেরই নামান্তর হবে।

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন বর্তমানে প্রচলিত তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সকেই সমর্থন করেছেন। তবে এর পাশাপাশি চার বছরের ডিগ্রী কোর্সের একটি পরিকল্পনাও কমিশন পেশ করেছেন। এই চার বছরের ডিগ্রী কোর্স নিয়ে যারা পাশ করবে তারা এই অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের কি সুবিধা পাবে কমিশন স্পষ্টভাবে তার কোন উল্লেখ করেন নি। যদি কোন বিশেষ সুবিধা তারা পায়ও তবু তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নানারূপ বৈষম্যের সৃষ্টি হবে।

অনুরূপভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীরক্ষেত্রেও কমিশন দু বছর ও তিন বছরের দুটি পাঠক্রম প্রবর্তনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কমিশন বর্তমান প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সটিকে কলেজ থেকে সরিয়ে এনে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

কমিশন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ত্রি-ভাষা সূত্র গ্রহণ করেছেন। অনেক শিক্ষাবিদ দ্বি-ভাষা সূত্রের শিক্ষাগত উপযোগিতা অনেক বেশী বলে মনে করেন। তবে প্রাচীনভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষার নির্দ্দেশ দিয়ে কমিশন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার্থীকে চতুর্থ

শ্রেণী পর্যন্ত একটি ভাষা, পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত দুটি ভাষা এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল—(১) পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরাজী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা চলবে না; (২) ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী কিংবা ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী—এই দুটি পর্যায়ের যে কোন একটি ইংরাজি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট করা চলতে পারে। অনেক শিক্ষকদের মতে শৈশবে শিশুর নতুন ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতা বেশী থাকে বলে প্রাথমিক স্তরেই তাকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো উচিত। তাছাড়া বর্ত্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী এই ন'বছর ধরে শিক্ষার্থীরা ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করেও যেখানে এই ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না সেখানে তিন বছর কিংবা ছ'বছরের জন্য ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এই ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

কমিশন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকতাবৃত্তিকে আকর্ষনীয় করার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গতভাবেই অনুভব করেছেন। কিন্তু কমিশন-প্রদত্ত বেতনহার সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অনুপযুক্ত হয়েছে। এইরূপ বেতন হারের দ্বারা শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি ঘটবে বলে মনে হয় না এবং সুযোগ্য ব্যক্তিরাও এই বেতন হারের দ্বারা আকৃষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ।

শিক্ষক-শিক্ষণ মানের উন্নয়নের প্রতি কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এই শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারার সঙ্গে একে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষক-শিক্ষন প্রতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়-তার কথা উল্লেখ করে কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তবমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে স্নাতক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণকে কিভাবে সমন্বিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কমিশন বিস্তৃত আলোচনা করেন নি।

কমিশনের রিপোর্টটি আগাগোড়া পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে কমিশন তাঁদের রিপোর্টের সূচনায় জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে কমিশনের যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি অব-লম্বনের ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি কিন্তু সে তুলনায় অনেকক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে।

পরিশিষ্ট ক

১৯৬৮ সালে ভারত-সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি

(National policy on education)

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন তার পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

১। ভারতীয় সমাজে শিক্ষার প্রতি সর্বদা মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনাহীন (unique) বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পূর্বে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুরূপভাবে জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

২। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি জাতীয় অগ্রগতি ও নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক হিসাবে শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান মনোযোগ দিতে থাকেন। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি শিক্ষা-পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন, এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) উল্লেখযোগ্য। এই সব কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি (Scientific Policy) সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নতুন করে বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) নিয়োগ করেন এবং এই কমিশনকে "জাতীয় শিক্ষার কাঠামো ও সর্বস্তরের শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করার

ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলা হয়।" কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর থেকে এই রিপোর্ট সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও নানারূপ মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে একটা সাধারণ ঐক্যমত স্থাপিত হয়েছে দেখে সরকার সন্তোষ প্রকাশ করছেন।

৩। ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার আমূল পুনর্গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, জাতীয় সংহতি এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হবে। এর জন্য জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত করতে হবে; শিক্ষাগত সুযোগের সম্প্রসারণের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে; সর্বস্তরের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক চেষ্টা করতে হবে; বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্য-বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা যুবক যুবতীদের এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্য ও চরিত্রবলের দ্বারা জাতির সেবা ও উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। কেবলমাত্র এইভাবেই শিক্ষা জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, নাগরিকতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একজাতীয় ধারণা গড়ে তুলতে পারে এবং জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করতে পারে'। ভারতের মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও অতুলনীয় আত্মশক্তিকে বজায় রেখে এই ভাবে অগ্রসর হতে পারলে তবেই আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্য আসন লাভ করতে পারবে।

৪। এইজন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রস্তাব গ্রহণ করছে:

(১) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা: সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান অপচয় ও নিশ্চল অবস্থা দূর করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রতিটি ছাত্র যাতে সাফল্যের সঙ্গে নির্দ্ধারিত পাঠ্যক্রম শেষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) **শিক্ষকদের মর্যাদা, বেতন ও শিক্ষার ব্যবস্থা :**

(ক) শিক্ষার মান এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার অবদানের ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষামূলক সকল প্রচেষ্টার সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও চরিত্র, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার উপর। সেইজন্য শিক্ষকেরা যাতে সমাজ-জীবনে সম্মানজনক স্থান লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের বেতন ও চাকুরীর সর্তাদির উন্নতিবিধানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও গবেষনা করার ব্যাপারে শিক্ষকদের শিক্ষা-গত স্বাধীনতা দিতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ ও রচনার অধিকার রক্ষা করতে হবে।

(গ) শিক্ষক-শিক্ষণ বিশেষভাবে চাকুরী-কালীন শিক্ষার (in-service education) উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) **বিভিন্ন ভাষার উন্নতি সাধন :**

(ক) আঞ্চলিক ভাষাসমূহ : শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে হবে। এ ছাড়া জনগণের সৃজনমূলক শক্তির বিকাশ ঘটবে না, শিক্ষামানের উন্নতি হবে না, জনগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে না এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও জন-সাধারণের মধ্যে ব্যবধান দূর হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ত্রি-ভাষা সূত্র : মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ত্রি-ভাষা সূত্রের মধ্যে থাকবে হিন্দীভাষী রাজ্যের জন্য—হিন্দী, ইংরাজী ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (দক্ষিণ ভারতের কোন একটি ভাষা হলে ভাল হয়) আর অহিন্দী-ভাষী রাজ্যের জন্য—আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরাজী। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে উন্নতমানের হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) **হিন্দী :** হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দীর বিকাশ সাধনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ভারতের মিশ্র (composite) সংস্কৃতির সকল উপাদান এই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। অহিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার জন্য কলেজ ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে হিন্দী হবে শিক্ষার মাধ্যম।

(ঘ) **সংস্কৃত :** ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনে সংস্কৃত ভাষার অবদানের কথা চিন্তা ক'রে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই ভাষাশিক্ষার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এই ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(ঙ) **আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ :** ইংরাজী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের কেবল পরিচয় থাকলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানও রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৪) **শিক্ষাগত সুযোগের সমানাধিকার প্রদান :** শিক্ষাগত সুযোগের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে।

(ক) শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে, এবং গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(খ) শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশ অনুযায়ী সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাধারণ বিদ্যালয় প্রথা (Common School System) চালু করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষামানের উন্নতি সাধন করতে হবে। পাবলিক স্কুলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

(গ) মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(ঘ) অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে।

(৬) শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর শিশুদের জন্য শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ করতে হবে এবং তারা যাতে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) **প্রতিভা সনাক্তকরণ** : যথাসম্ভব অল্পবয়সে প্রতিভাবান শিশুদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সব-রকম সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দিতে হবে।

(৬) **কর্ম-অভিজ্ঞতা ও জাতীয় সেবা** : উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য স্থাপন করতে হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং সমাজ সেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে 'সমাজসেবা' শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। এই জাতীয় কর্মসূচীতে স্বাবলম্বন (Self-helf), চরিত্রগঠন ও সমাজের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার মনোভাব গড়ে তোলার উপর জোর দিতে হবে।

(৭) **বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা** : জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটাবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক বিদ্যালয় স্তরের সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে।

(৮) **শিল্প ও কৃষি শিক্ষা** : শিল্প ও কৃষিশিক্ষার উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(ক) প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসম্ভব একটি বিষয়ের চর্চ্চা হবে ; তবে প্রয়োজন-বোধে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য অঙ্গীভূত (constituent) কলেজ থাকতে পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হলে কৃষিশিক্ষার শক্তিশালী বিভাগ গড়ে তুলতে হবে।

(খ) কলকারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কারিগরি শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

(গ) কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে মানবশক্তির চাহিদার ক্রমাগত পরিমাপ করতে হবে এবং শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ও চাকুরীর সুযোগের মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য বজায় রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(৯) **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন** : সুযোগ্য লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক

ও উৎসাহ দিয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় আকৃষ্ট করতে হবে। বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘন ঘন পাঠ্যপুস্তক বদল করা চলবে না এবং দরিদ্র ছাত্রদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল্য কমাতে হবে।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্বয়ংশাসিত বুক করপোরেশন স্থাপনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সারা দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক চালু করার চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের জন্য পুস্তক রচনা এবং আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুস্তক রচনার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(১০) **পরীক্ষা:** পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্য হবে, পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (reliability) ও যথার্থতার (validity) উন্নতি সাধন একটি মূল্যায়নকে একটি অবিরাম পদ্ধতিতে (continuous process) পরিণত করা, যাতে কোন এক মুহূর্তের কাজের যোগ্যতা বিচার করার পরিবর্তে তার সাফল্যের মান আরও উন্নত করা যায়।

(১১) **মাধ্যমিক শিক্ষা:** (ক) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাগত সুযোগের উপর সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তর অনেকখানি নির্ভর করে। অতীতে যে সব অঞ্চল ও সম্প্রদায় মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগে প্রসার ঘটাতে হবে।

(খ) এই স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রয়োজন ও চাকুরীর সুযোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, যথা—কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, গৃহস্থালি, চারুকলা ও হস্তশিল্প প্রভৃতি।

(১২) **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা:** (ক) কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা নির্ভর করবে বীক্ষণাগার, পাঠাগার, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষক সংখ্যার উপর।

(খ) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে। উপযুক্ত অর্থ ও প্রয়োজনীয় মানের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

(গ) স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের সংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ

দিতে হবে। এই স্তরের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মান উন্নত করতে হবে।

(ঘ) উন্নত শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সর্ব্বোচ্চ মানের দিকে লক্ষ্য রেখে অল্প সংখ্যক কেন্দ্র-গুচ্ছ (cluster of centres) স্থাপন করতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা চালাবার ব্যাপারে অধিক সাহায্য করতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখবে।

(১৩) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং ডাকযোগে শিক্ষা ঃ
(Part-Time Education and Correspondence Courses)

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের এই জাতীয় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষাকে পূর্ণ-সময়ের শিক্ষার মর্যাদা দিতে হবে। জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ ইচ্ছা সত্বেও পূর্ণ-সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তারা এর ফলে শিক্ষার সুযোগ পাবে।

(১৪) স্বাক্ষরতার প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষা ঃ (ক) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। বৃহৎ বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিরা যাতে শীঘ্র অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে শিক্ষকও ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কার্যরত তরুণ চাষীদের শিক্ষা এবং যুবকদের আত্মনিয়োগের (self employment) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(১৫) খেলাধূলা ও স্পোর্টস ঃ সাধারণ ও খেলাধূলায় পারদর্শী ছাত্রদের শারীরিক সক্ষমতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে খেলাধূলা ও স্পোর্টসের উন্নতি সাধন করতে হবে। যেখানে খেলাধূলার মাঠ কিংবা শারীর শিক্ষার অন্যান্য সুযোগসুবিধার অভাব আছে সেখানে ঐসব অভাব মেটানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(১৬) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা ঃ ১৯৬১ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৭) **শিক্ষার কাঠামো :** দেশের সর্বত্র মোটামুটিভাবে শিক্ষার এক জাতীর কাঠামো থাকলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে ১০+২+৩ এই কাঠামো প্রবর্ত্তন করা। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে দু বছরের উচ্চতর মাধ্যমিকস্তর স্কুল অথবা কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

৫। উপরে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এর জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

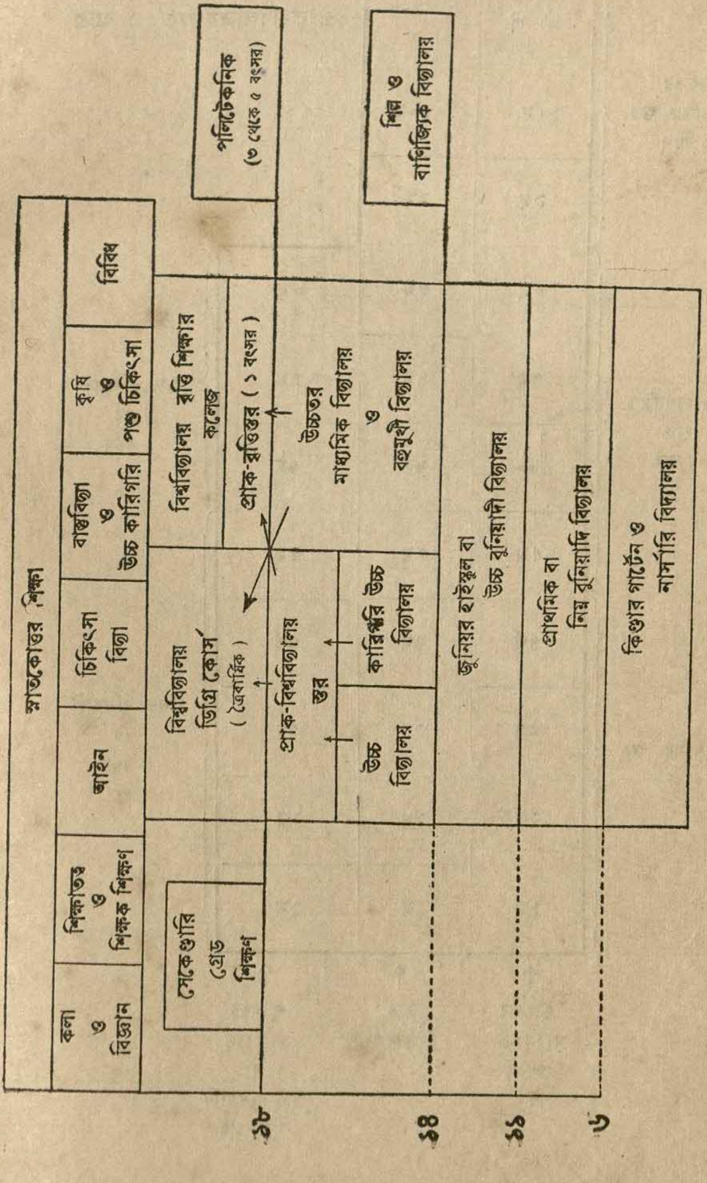
৬। ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। সঙ্গতির অভাব ছাড়াও আরও অনেক জটিল সমস্যা রয়েছে। দেশের বস্তুসম্পদ ও মানব সম্পদের বিকাশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা চিন্তা ক'রে ভারত সরকার নিজস্ব কর্মসূচী ছাড়াও যেখানে জাতীয় প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার সেখানে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করবে।

৭। ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করবেন। [১]

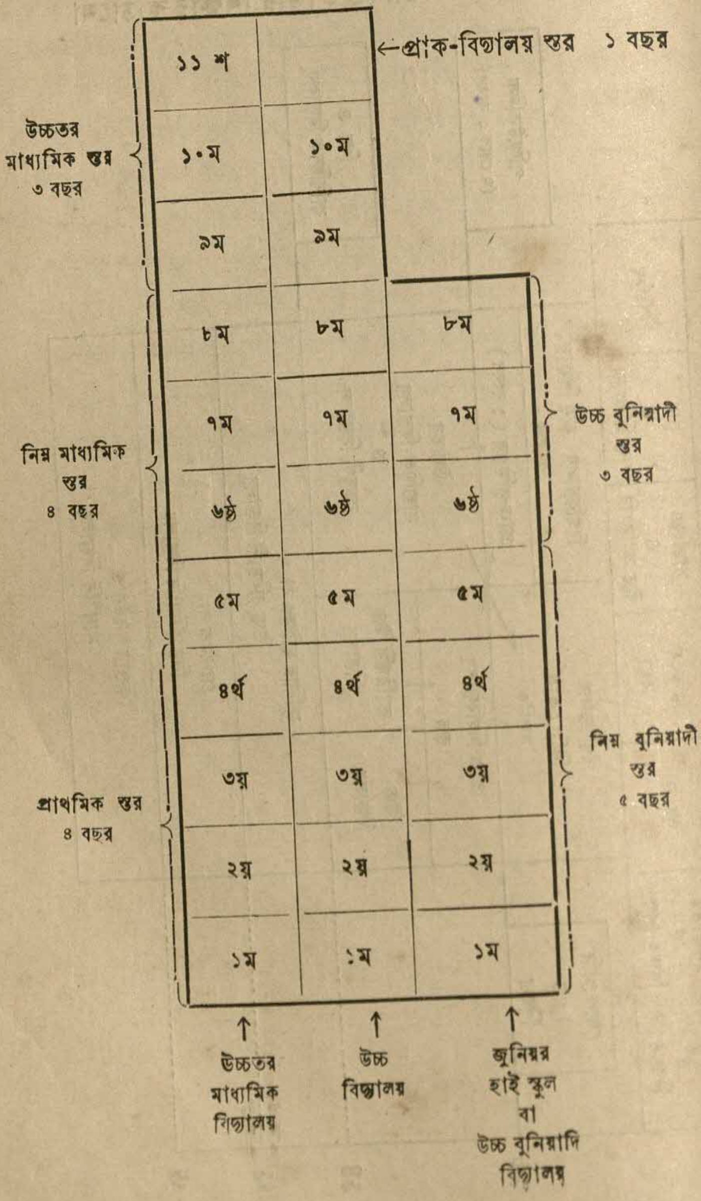
ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'National Policy on Education' নামক পুস্তিকার অনুবাদ।

পরিশিষ্ট খ

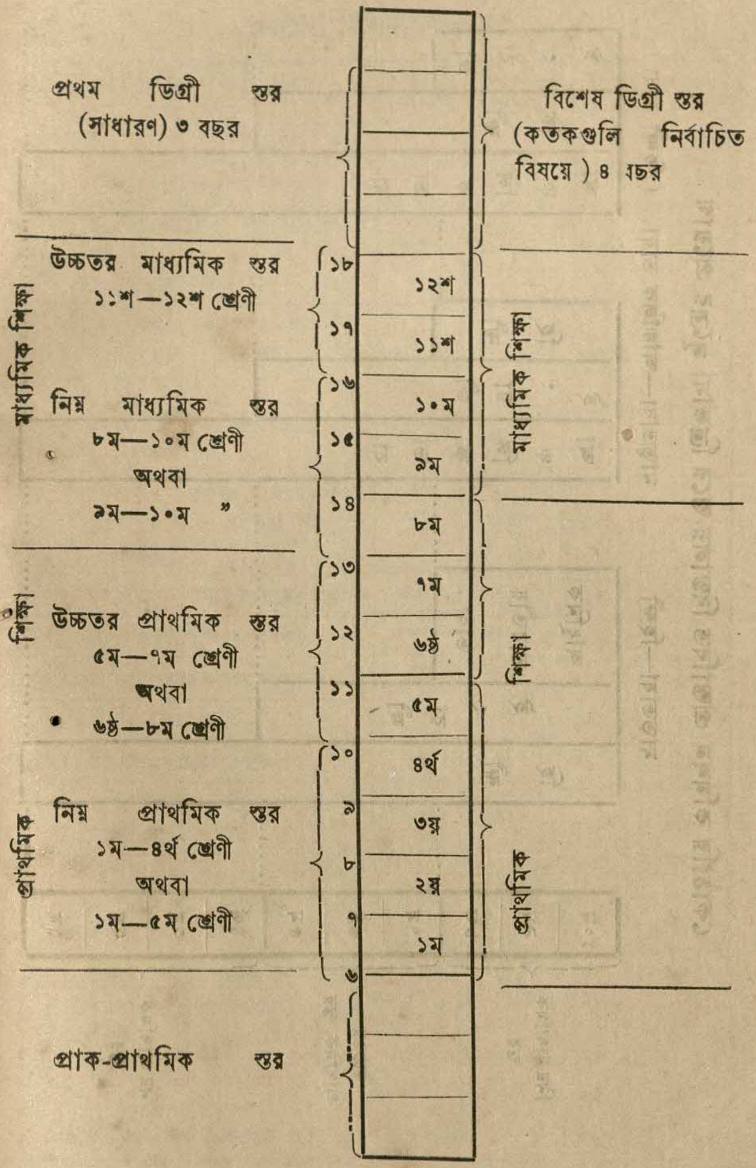
মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার কাঠামো



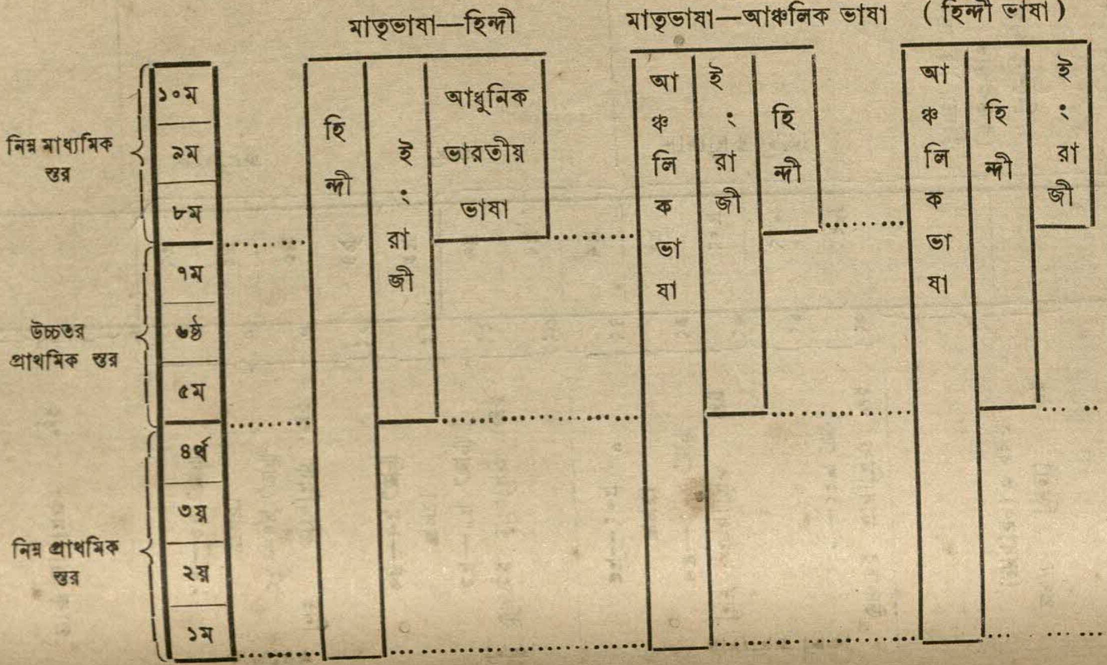
পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্ত্তমান কাঠামো
(মুদালিয়র কমিশনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ)



কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠামো



কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্তরে ত্রিভাষা সূত্রের প্রয়োগ



প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
১। প্রাথমিক নিম্নবুনিয়াদী স্তর :— (ক) বিদ্যালয় সংখ্যা	২০৯৬৭১	২৭৮১৩৫	৩৩০৩৯৯	৪০৮৯৩০
(খ) ৬-১১ বয়সের লোক সংখ্যার শতকরা হিসাবে ছাত্র সংখ্যা	৪২.৬%	৫২.১%	৬২.৪%	৭৬.৪%
২। নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বুনিয়াদী স্তর :— (ক) বিদ্যালয় সংখ্যা	১৩৫৯৬	২১৭৩০	৪৯৬১৩	৫৫৭৫৬
(খ) ১১-১৪ বয়সের লোকসংখ্যা অনুপাতে শতকরা হিসাবে ছাত্রসংখ্যা	১২.৭%	১৬.৫%	২২.৫%	২৯.৫%
৩। উচ্চমাধ্যমিক স্তর :— (ক) বিদ্যালয় সংখ্যা	৭২৮৮	১০৮৩৮	১৭২৫৭	২১১৫৬
(খ) ১৪-১৭ বয়সের লোকসংখ্যা অনুপাতে শতকরা হিসাবে ছাত্রসংখ্যা	৫.৩%	৭.৮%	১১.৭%	১৫.৭%
৪। কলা-বিজ্ঞান-কমার্স-কলেজের সংখ্যা—	৫৪২	৭৭২	১১২২	১৪০০
৫। পেশা ও বৃত্তিশিক্ষার কলেজ সংখ্যা—	২০৮	৩৪৬	৮৫২	১০৭৭
৬। বিশেষ শিক্ষার কলেজ সংখ্যা—	৯২	১১২	২০৪	২৫৭
৭। বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা—	২৭	৩২	৪৫	৬৪
৮। গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা—	১৮	৩৪	৪১	৪৪
৯। মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	২৩৩৯	৩০৭৪	৪১৪৫	৫৮৪৪
১০। মোট ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের শতকরা হিসাবে ছাত্র সংখ্যা	২৮.১%	৩৩%	৩৪.১%	৪২.৫%
১১। ১৭-২৩ বছর বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা	০.৯%	১.৫%	১.৮%	১.৯%
১২। শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ :— (ক) সংখ্যা	৫৩	১০৭	২৭৮	৩১২
(খ) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার	৫৩.৮%	৫৯.৭%	৬৪.১%	৬৬.২%
১৩। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল :— (ক) ডিগ্রী কলেজ সংখ্যা	৫৩	৭১	১১১	১৩৩
(খ) ডিপ্লোমা কলেজ সংখ্যা	৮৯	১০৯	২০৯	২৭৪

পরিশিষ্ট গ

বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট সংক্রান্ত এবং এই গ্রন্থে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

1. Discuss the main recommendations of the Education Commission (1964-66) for the improvement of Secondary education in India. Give your views on them.
(Paper IV—1967)

2. Discuss the language problem of Secondary Education of West Bengal. How would you propose to solve it ?
(Paper IV—1965)

3, What are the problems of University education in West Bengal ? Discuss how far they are going to be solved by the establishment of new Universities.
(Paper IV—1965)

4. How far have the main recommendations of the Secondary Education Commission (Mudaliar Commission) been adopted in West Beagal and with what results ?
(Paper IV—1963)

5. Discuss the main recommendations of the Mudaliar Commission and state to what extent these have been implemented . (Paper IV—1961)

6, In starting a new School what should be your estimate of an ideal School plant ? Give a detailed description of the various equipments and accessories that different Components of a modern school must possess.
(Paper III—'67' 68)

7. Extra curricular activities are now regarded as an integral part of education. Discuss. (Paper III—1966)

8. Distinguish between health education and physical education. Offer your suggestions for the proper organisation of health education in our schools. (Paper III—1967)

9, "Activity is the essence of modern teaching method."

Critically discuss how far the progressive teaching practices of today have been influenced by the new activity pedagogy. (Paper III—1965)

10. Enumerate the dangers that lurk in the system of public examinations and discuss the remedies for evils of examinations. (Paper III—1964)

11. What should be the determining factors of a curriculum ? Illustrate your answers by an examination of the existing secondary School curriculum. (Paper I—1967)

12. Discuss what has already been done by way of curriculum reform at the Secondary stage. How far has it fulfilled the expectations of the Mudaliar Commission ? (Sp. Paper—1967)

13. Describe the new organisational pattern of Secondary education proposed in the Madaliar Commission Report. How far have the suggestions made in this regard been implemented and with what effect ? (Sp. Paper—1966)

14. Trace the lines on which a national system of education is developing in India. (Paper IV—1966)

15. Discuss the problems of medium of instruction in Schools and colleges of Indian education and state how it is being tackled. (Paper IV—1966)